বহুমাত্রিক

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা

৮ম বর্ষ ২১শ সংখ্যা

প্রধান সম্পাদক

আব্দুর রাজ্জাক

সম্পাদক

রেবেকা আমান

কার্য নির্বাহী সম্পাদক

হাবিবুর রহমান

সহযোগিতায়

সারতাজুল ইসলাম

এস, এম, আমজাদ হোসেন

সৈয়দ আহমদ হোসেন বাদল

আতাউর রহমান ভূঁইয়া

কম্পিউটার কম্পোজ ও ওয়েব সাইট

আনোয়ার হোসেন শিপন

www.geocities.com/newshipon/shipon.htm

এ সংখ্যা বহুমাত্রিক নিবেদিত হলো প্রধান সম্পাদক ও লেখক গোষ্ঠীর সভাপতি বিদায়ী কবি আব্দুর রাজ্জাককে

জেদ্দা লেখক গোষ্ঠী

সংস্কারমুক্ত না হলে বহুমাত্রিক পড়বেন না।

যোগাযোগ : ফোন ৬৩৬ ৭২১১, ফ্যাক্স : ৬৩৭ ৩০১৫

ইমেইল : bohumatrik@email.com

সম্পাদকের কথা

এবারের ২১শে ফেব্রুয়ারীর ২টি মাত্রা। একটি মহান ভাষা আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তি এবং ২য়টি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ৩য় বার্ষিকী। দেশে এবং প্রবাসে বাংলা ভাষাভাষীদের সাথে বিশ্বের অন্যান্য ভাষাভাষীদের কাছেও এ দিনটির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সন্দাতীতভাবে মূল্যবান। বাংগালী কমিউনিটি সীমিত সাধ্যে মহান শহীদ দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যকে তুলে ধরার প্রথম প্রায়াস চালান কিন্তু স্বদেশে মহান শহীদ দিবসের এই সবর্ণজয়ন্তীতে রাজনৈতিক পালাবদলের সন্ধিক্ষণে অতি চতুরতার সহিত একুশের মর্মভেদী চেতনাকে শিকড় সমেত তুলে ফেলার সকল আয়োজন এ বছর অর্থাৎ ২০০২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারীতে সম্পন্ন হলো।

বাংলা সাহিত্যের মূল উপজীব্যের উৎসধারা প্রবাহিত হওয়ায় একুশের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ ও গৌরব যা আমাদের জাতি হিসেবে করেছে মহিমান্বিত সেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জনকে ভুলিয়ে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতার নির্যাস পান করার একটি আয়োজন এই ২১শে ফেব্রুয়ারীতে শুরু হয়েছে যা আমাদের প্রত্যাখ্যাত দ্বিজাতিতত্ত্বের গুনকীর্তনে ৪৭ সনের পাকিস্তান ভাবধারায় ফিরিয়ে নেয়ার একটি অপকৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়েছে এবারের একুশে। অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় নূতন প্রজন্মের কবি সাহিত্যিকেরা যারা একদিন মুক্ত চিন্তার চর্চা করে বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনকে উত্তরণের পথে এগিয়ে নিয়েছিল তারা হতাশাজনকভাবে নিশ্চুপ।

২১শে ফেব্রুয়ারীর সন্ধ্যার অন্ধকারে টি.এস.সির চত্বর। বইমেলায় নিষ্প্রদীপ মহড়া দারুণভাবে হতাশ করেছে প্রত্যক্ষদর্শীদের। বাংলা সাহিত্যের ক্রান্তিকালে বহুমাত্রিক হতাশ অন্ধকারে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে যা সময়ের দাবী মাত্র।

২১শে ফেব্রুয়ারীর মত স্বাধীনতা দিবসও ছিল জৌলুসহীন। সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়েছে দায়সাড়া ভাব।

৬৯ এ গণআন্দোলন যা শেষ পর্যায়ে গণবিস্ফোরণে পরিণত হয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে ৭১ এর রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল। যে জাতীয়তাবাদীর চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালী জাতি একটি সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের "চিলেকোঠার সেপাই" সেই সংগ্রামের সুতোটাকে ধরিয়ে দেয়। আমরা স্বল্প পরিসরে ক্ষীণতনু বহুমাত্রিক এ ব্যতিক্রমধর্মী স্বাধীনতা দিবস উপস্থাপন করেছি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের মাধ্যমে। একুশ বিনাশী একুশের একটি দুঃখজনক চিত্রও এই সঙ্গে সন্বিবেশিত হলো।

বাংলা নববর্ষ ১৪০৯ পালিত হলো স্বদেশে এবং বিদেশে। স্বদেশে অবস্থানকালের ঐতিহ্যে লালিত ১লা বৈশাখ বা নববর্ষের বেচাকেনার হাটে নিলামে উঠেছে। অত্যন্ত দৃষ্টিকটুভাবে পুলিশী ব্যরিকেডের মধ্যে এবারের নববর্ষ উৎযাপিত হয়েছে যা আমাদের চিন্তা ও চেতনায় ও বাঙালি মানবাধিকারের পরিপন্থি। অপরদিকে প্রথম বাংলা নববর্ষকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয়েছে বৈশাখী মেলা ও আবহমান বাংলার প্রকৃতি ও সুন্দরের শুভ বরণের মাধ্যমে। এ সংখ্যার বহুমাত্রিকে আমরা ২০০১ এর বেদনাদগ্ধ নববর্ষের বোমাহত্যায় নিহতদের স্মরণে সর্বনাশের সকালবেলা নামক গল্পটি পত্রস্থ করতে পেরেছি। রবীন্দ্র জয়ন্তী এবারের আয়োজনে আমাদের সামান্যই। একটি মাত্র লেখা ছাড়া আর কোনো লেখা পত্রস্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ আমাদের চেতনায় সব সময়ই উপস্থিত। তাকে নিয়ে বিশেষ দিনে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে হবে এ ধারণায় আমরা বিশ্বাসী নই। ভিন্ন চেতনায় সংযোজিত হলো 'একুশ বিনাশী একুশ।' বহুমাত্রিক প্রতিবেদনে লেখাটি পাঠকদের একটু বাড়তি আনন্দ দেবে বলে আমাদের বিশ্বাস। যারা ইতিহাসকে পরিহাসে পরিণত করার নোংরা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে আমরা সচেতনভাবে তাদের পরিহার করতে চাই। প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে একটি নান্দনিক ধারায় প্রবাহিত করার মানসে সপ্রনদিত হয়ে নিজেদেরকে নিবেদিত করেছেন আমরা তাঁদেরকে অবশ্যই অভিনন্দন জানাই। তাদের সঙ্গে আমরা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করতেও বদ্ধ পরিকর।

হাবিব আজাদ

....

২০০২ : একুশে বিনাশী একুশে

শিরোনামের প্রকাশ্য সত্য প্রচ্ছন্নতার ছায়া মুছে পরিস্ফুটিত আপন চেতনায়। শুরুতেই মুখোমুখি বলা ভাল হোচট খাওয়া যে পরিবেশে তার নির্মিতি ২০০১ এর অক্টোবরে। প্রতি বছরের ন্যায় এক বুক আশা নিয়ে এবারও যাত্রা ছিল পদযুগলের নগ্নতায় পবিত্র ধুলির অলংকার পড়ে মহান শহীদ মিনারে। হা হতোস্মি! বিস্ময়ের আঁছাড় সামলিয়ে নয়ন যুগলের পীড়া ভেদ করে মর্মদহনের অনলকুন্ড ক্রমাগত জ্বালা বাড়াতে থাকলো।

সকাল সাড়ে ১১টায় সরকারীভাবে একুশের আনুষ্ঠানিকতার সমাপ্তি ঘোষিত হলো। ঘোষক, যিনি স্যুট টাই শোভিত কেতাদুরস্ত কালো সাহেব। তার কণ্ঠ নিসৃত অমৃত সুধায় নিমিষে খালি হয়ে গেল "আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো" শহীদ মিনারের বিশাল চত্বর। বৈপরীত্যের বিসদৃস্য দৃশ্য দেখে সংগিনী বাসায় চলে গেলেন গোস্যা হয়ে। একা দাঁড়িয়ে রইলাম ঠায়। আজো স্পষ্ট মনে আছে গত বছরের কথা। দীর্ঘ লাইন। শুরু হয়েছে সেই আজিমপুর পুরানো গোরস্থান থেকে। সময়ের রশি ধরে দীর্ঘ লাইন অতিক্রম করলাম তীর্থযাত্রীর মত। যখন শহীদ বেদীতে ফুল দিয়ে বেরিয়ে আসলাম তখন দুপুর সাড়ে তিনটা। তারপরও লাইনের দীর্ঘতা হ্রস্যতায় পরিণত হলো না। আর এবার সাড়ে ১১টায় সব শেষ। ছোট ছোট টোকাই বাচ্চারা শহীদবেদী থেকে ফুলের তোড়া এনে পায়ে মাড়িয়ে আনন্দখেলা খেলছে। দর্শক যারা, তখনো ছিলেন শহীদ মিনারের দিকে পিঠ দিয়ে সবুজ চত্বরে বসে, গুলতানি মারছেন আর বাদাম বুট ও খিরার শ্রাদ্ধ করছেন। এদিক ওদিক যাঁরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে তখনো শহীদ মিনারের দিকে তাকিয়ে আছেন। তাদের মাঝে দেখলাম বাঁ দিকের গেটের পাশে মতিয়া চৌধুরী। অনেকেই সালাম দিয়ে তাঁর সাথে কুশল বিনিময় করলেন। ছোট ছোট বাচ্চাদের মাথায় হাত দিয়ে কপালে চুমু খেয়ে তিনি আদর দোয়া করলেন।

আমার মনে পড়লো একাত্তরের ১লা মার্চের কথা। ইয়াহিয়ার একটি ঘোষণায় পার্লামেন্টের অধিবেশন স্থগিত হয়ে গেল। ষ্টেডিয়ামে তখন চলছে পাকিস্তান বনাম এম.সি.সি.'র ক্রিকেট খেলা। খবরটি শুনে আমরা সবাই দলবেঁধে ষ্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে এলাম "জয় বাংলা" ধ্বনি দিয়ে। মুহূর্তে ঘটে যাওয়া গুলিস্তানের মোড় বিশাল জন সমাবেশে পরিণত হলো। কামানের উপর দাঁড়িয়ে অগ্নিকন্যা মতিয়ার চৌধুরী তাঁর অবিস্মরণীয় অগ্নিঝরা ভাষণটি দিলেন। চুল শাদা হয়ে গেছে। পুলিশী পিটুনীতে শরীর অনেকটা অশক্ত। অজান্তে চোখ দিয়ে ক'ফোটা পানি গড়িয়ে পড়লো। মনে মনে তাঁর পায়ে প্রণতি রেখে কোন কথা না বলে সংগিনীর হাত ধরে কেটে পড়লাম অন্যদিকে।

দুপুর সাড়ে ১২টা। সবুজ চত্বরের নীচে রাস্তার দুপাশে পসরা সাঁজিয়ে একুশের মেলা বসে গেছে। ইতিউতি মানুষ দেখছে জিনিসপত্র। কেনাকাটা কম। যা একটু ভীড় ফুচকার দোকানে - সকালের নাস্তার জন্য। শহীদ মিনারের দিকে মুখ করে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। স্মৃতি তাড়ানিয়া দুঃখ জাগানিয়া ভাবনাবিষাদ আমাকে তাড়িয়ে নিচ্ছে দূর হতে দূরে সুদূর অতীতে। গলায় পান-বিড়ি-সিগারেটের ডালা ঝুলিয়ে ফেরীওয়ালা সামনে হাজির। কোনটিতেই আসক্তি নাই শুনেও গেল না সে। দুটি একটি কথা দিয়ে আলাপ জমিয়ে দিলাম তার সাথে। বোঝা গেল সেও আনন্দ পাচ্ছে। দেখা গেল জড়তা কাটিয়ে ফেরীওয়ালাকে কথায় পেয়ে বসেছে। আমিও দোহারকির মত খেই ধরিয়ে দিয়ে নীরব শ্রোতা।
- স্যর।
- এদেশে আর গরীব থাকবে না।
আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে অনুসরণ করে -
মোটা চাল আগে ছিল ১১/১২ টাকা। এখন ১৫/১৬ টাকা। দিন দিন বাড়ছেই। গরীবতো এমনিতেই না খেয়ে মরে যাবে। সরকার গ্যাস রফতানী করে বড়লোকদের আমেরিকান গাড়ী দেবে। বাংলাদেশে আর গরীব থাকবে না স্যর।
আমি তাজ্জব বনে গেলাম ওর কথা শুনে। কতক্ষণ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম জানি না। ১ শলা সিগারেট বিক্রির জন্য সে চলে গেল অন্য দিকে। যাওয়ার আগে জানিয়ে গেল সে -
- সকাল বেলা ৫শত টাকা ধার করে ৪৭৪ টাকার মাল এনেছি স্যর। ১ প্যাকেটও সিগারেট বিক্রি করিনি। এ পর্যন্ত মাত্র ১০ টাকা বেচেছি।

কি করে চলবে এ গরীব ফেরীওয়ালার? তাদের মত কোটি কোটি বংগ সন্তানের?? ভাবতে ভাবতে বাংলা একাডেমীর দিকে পা বাড়ালাম।

বাংলা একাডেমী খালি। মঞ্চের সামনে পেতে রাখা শূণ্য চেয়ারগুলি খা খা করছে। অতীত একুশে সারাদিন কবিতা আবৃত্তি চলতো। বিকালে আলোচনা সভা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এবার একুশেতে কবিতা আবৃত্তি নেই। হয়তো ছিল সকালে। এখন নেই। ফুটপাত দিয়ে এগিয়ে চললাম হাই কোর্ট মাজারের দিকে। এদিকটায়ও ফুটপাতের দুপাশে পসরা সাজিয়ে বসে গেছে দোকানীরা। কি নেই এ সব দোকানে। মুক্তোর মালা থেকে বই সহ সংসারের খুটিনাটি সবই পাওয়া যায় এ ফুটপাতের মেলায়। প্রেস ক্লাব ডানে রেখে আমার গন্তব্য হোটেল সম্রাট। যার উদ্দেশ্যে যাওয়া সে নেই। অগ্যতা এ্যাবাউট টার্ণ। বাংলা একাডেমীর গেটের কাছেই দেখি মৌরী, মুক্তা ও স্বাতী দোকানীদের সাথে কলকল করছে। ওরা দেখার আগেই সরে পরলাম। চেয়ারগুলো এখনো খালি। তবে আমার মত নাছোড়বান্দা দু'চারজন বসে আছেন। কেউ পত্রিকা পড়ছেন বা বাদাম চিবুচ্ছেন। আশ্চর্য্য একুশের ১টা সংকলনও হাতে পাওয়াতো দূরের কথা চোখেও দেখলাম না। ডান পাশের বই মেলা দুপুরের কাকের মত ঝিমুচ্ছে। "আমার লাইন হয়ে যায় আঁকা বাঁকা। ভাল না মোর হাতের লেখা।" এ চটুল গানটি শুনেছিলাম বাংলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক মঞ্চে ২ দিন আগে। গায়কের হেলেদুলে রং ঢং দেখে সংগিনী বললেন চলো উঠি। অন্য কোথাও যাই। শহীদ দিবসে এ গান ! ছি !!

আজ কি গান শুনাবে কর্তৃপক্ষ জানি না। তবে গুটি গুটি লোকজন আসছে। ঘোষণা হলো আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বর্ষিয়ান কবি আবুল হোসেন এবং প্রধান বক্তা ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন। যিনি ৫২-র রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে "রাষ্ট্রভাষা মতিন" নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। পরবর্তী কালে মাওবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির একটি অংশের নেতৃত্ব দিতে চারু মজুমদারের লাইন অনুসরণ করে দীর্ঘ দিন ভূতলবাসী ছিলেন। আব্দুল মতিনের নাম শুনে আমরা সবাই নড়ে চড়ে বসলাম। বয়সের ভারে সামান্য নুহ্য হয়ে গেছেন। ছোট ছোট পা ফেলে এগিয়ে গেলেন মঞ্চের দিকে। সিঁড়িতে অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে মঞ্চে উঠলেন - উপবেশন করলেন। বাংলা একাডেমীর সদ্য নিযুক্ত মহা পরিচালক অধ্যাপক মনসুর মুসা তাঁর সদ্যজাত পদের আঁতুড়ে গন্ধ মেখে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তারপর শুরু করলেন অভিজাত কবি আবুল হোসেন। অবসর প্রাপ্ত আমলা কবি বাংলা ভাষার বির্তনের আধুনিকতায় আঞ্চলিক প্রভাব নিয়ে "ঘটি" ও "বাঙালের" মধ্যকার বিভেদকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। আবুল হোসেনের ধ্রুপদী কবিতার সাথে যারা পরিচিত তারা জানেন তাঁর ভাষারীতির আভিজাত্য শব্দ প্রয়োগের সতর্ক মুন্সিয়ানা তাঁর কবিতাকে কতখানি ঋদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছে। "আবুল হোসেন" ক্লাসিক বাংলা কাব্যাঙ্গনে একটি শ্রদ্ধেয় কবির নাম।

সত্য কথা বলতে কি, আমাদের আগ্রহ ছিল আব্দুল মতিনের কথা শোনার জন্য। অসুস্থ বিধায় তিনি বসেই শুরু করলেন। সাবেক পূর্ব পাকিস্তান ও বর্তমান বাংলাদেশের রাজনীতি, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উত্থান পর্বকালের সার্বিক অবস্থা নিয়ে যারা উৎসাহী বিশেষভাবে বাম রাজনীতি সেই সব ইতিহাস সচেতন লোকজনের নিকট ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন একটি সুপরিচিত নাম বলা চলে রোমাঞ্চকর নাম। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী দিনটির তিনি বিস্তারিত হৃদয়বিদারক বর্ণনা দিলেন। যদিও তাঁর বিশদ আলোচনার সব মন্ত ব্যের সাথে একমত হতে পারেনি। তবে এটাও অনস্বীকার্য যে ব্যক্তি বিশেষকে গ্লোরিফাই করার জন্য অনেক অতিরঞ্জিত কাহিনী ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে যোগ হয়েছে। তবে এটাও সত্য ব্যক্তিক কারিশমা ভাষা আন্দোলনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মতিন সাহেব অকপটে স্বীকার করলেন ভাষা আন্দোলনের ১ম পর্বে তিনি জড়িত ছিলেন না। ২য় পর্বে তাঁর জড়িত হওয়াটাও হঠাৎ করেই। তবে ২য় পর্বের আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে আব্দুল মতিনের বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক সময়ে সাহসী সিদ্ধান্ত গ্রহন আন্দোলনকে বেগবান করেছে এটা সবাই স্বীকার না করলেও নিরেট সত্য। "পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির" লেখক বদরুদ্দিন উমর ব্যক্তিগত ভাবে ভাষা আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন না। তিনি কোলকাতা থেকে বা বর্ধমান থেকে ঢাকা আসেন ১৯৫৩ সালে। তিন পর্বে সমাপ্ত তাঁর বিশাল গ্রন্থটি লেখার উপাদান সংগৃহীত হয়েছে তাজউদ্দিন আহমদের ডায়রী থেকে। অতি সম্প্রতি ২ খন্ডে সমাপ্ত ভাষা সৈনিক শহীদ তাজউদ্দিন আহমদের ডায়রী প্রকাশিত হয়েছে। এ ডায়রীটি প্রকাশিত হওয়ার পর ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতির সঠিক চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। আব্দুল মতিনের দীর্ঘ বক্তব্যে ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটে উঠে নাই। তিনি বক্তব্যের মাঝে মাঝে বার বারই বলছিলেন হয়তো আগামী ২১শে

ফেব্রুয়ারী আপনাদের সাথে আর দেখা নাও হতে পারে। কথাটা শুনে বুকের ভেতরটা ব্যথায় মোচর দিয়ে উঠছিল। জীবনে এই প্রথম, বোধহয় এই শেষবার দেখলাম ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিনকে। আমার জীবনের একটা অপূর্ণ সাধ পূর্ণ হলো। পাতা ঝরার গান তার কানে রিনিঝিনি বাজছে তখনো তিনি সীমাবদ্ধ গন্ডীর সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে মহত্তর উদারতায় বিকশিত হতে পারেননি। এটা শুধু বাংলা ভাষা ও বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসেরই দূর্ভাগ্য নয় সমান দূর্ভাগ্য তাঁর নিজেরও।

অচলায়তনের ঘেরা টোপে ঢাকা বই মেলা ঝিমুচ্ছে বুড়োভামের মত। দর্শক ক্রেতাদের ভেতর একটি যাই যাই ভাব। ব্যতিক্রম শুধু 'অন্যদিন' প্রকাশনীর সামনে। লম্বা লাইন তরুণ তরুণীদের। ঘটনা দেখার জন্য এগিয়ে গেলাম সামনে। দেখি হুমায়ুন আহমেদ বসে আছেন। অটোগ্রাফ দিচ্ছেন তাঁর সদ্য প্রকাশিত বইয়ে। সমুদ্রগুপ্ত হেঁটে বেড়াচ্ছেন। দেখা গেল ছোটখাটো মহাদেব সাহাকেও। একটি দোকানে রবীন্দ্র গোপ গুলতানি মারছেন। দেখি মেলার বাত্তি জ্বলছে আর নিভছে। কি ব্যাপার? মেলা বন্ধ হওয়ার আগাম সংকেত। ঘড়ির কাঁটা তখন ৮টা ছুঁই ছুঁই। তাড়াতাড়ি কিনে ফেললাম "তাজউদ্দিন আহমদের ডায়রী।" ৮টায় মেলা শেষ! হায়! আগের দিনেতো ১০টা পর্যন্ত আড্ডা মেরেছি। ধাক্কালেও বের করা যেতো না। সে "রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই"। অতঃপর যাত্রা শুরু পদব্রজে টি.এস.সির. দিকে। অন্ধকার টি.এস.সিকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে গেলাম সামনে। মিষ্টি ধোঁয়া উঠা রসেটম্বুর ভাপা পিঠার ভ্রাম্যমান ষ্টলে ভিড় একটু ক্রেতাদের। আধুনিক নগরজীবনে ভাপা পিঠার স্বাদ নেয়া ফুটপাতের দোকানে। কুপি বাত্তির নিম আলোকে পথচলা। চারুকলা ইনষ্টিটিউটের সামনে এসে চোখ ধাক্কা খেল জন সমাগমে। ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠলাম। আলো আঁধারিতে বসে আছে হাজারো মানুষ। বকুলবেদীতে বসে আছেন কলা কুশলীরা। পশ্চিম বঙ্গ থেকে আগত শ্যামশ্রী সেন গুপ্ত এখনই গাইবেন। বাংলা একাডেমীর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা আমার কাছে উপভোগ্য ছিল না গগনবিদারী কর্কস আওয়াজ ও উল্লেখ্য কোন শিল্পীর আনুপস্থিতির কারণে। কিন্তু এখানে দেখলাম অন্যধারা। বসে গেলাম একটা চেয়ারে। সামনে আর একটি চেয়ারে পা উঠিয়ে পাটা একটু টান করতেই পেছনের সহাস্য দম্পতির চন্দ্রবদন। আস্তে করে পা দুটি নামিয়ে মনোযোগ গানে। কোথা দিয়ে ১০টা বেজে গেল টেরই পেলাম না। ছেলেমেয়ের উৎকণ্ঠিত মুখ ভেসে উঠলো। অতঃপর উঠতেই হলো। পেছনে পরে রইলো সেই একুশ যে একুশ আমাকে টানে চুম্বকের মত দূর প্রবাসে। ফেব্রুয়ারী এলেই আমি আনমনা অস্থির হয়ে যাই। সে একুশকে পেছনে রেখে আমার সামনে চলা। কদিন পরে প্রিয়তম মানুষ তিনটি পেছনে রেখে চলে যেতে হবে আরো সামনে।

অহিদুল ইসলাম

....

আর এক পৃথিবী

এক

বিচিত্র এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার। ওর বয়স চৌদ্দ কি পনেরো আমি খুব নিশ্চিত করে বলতে পারবো না, তবে বরাবরই অনুমান সাপেক্ষ।

আশ্চর্য হয়েছিলাম মেয়েটাকে প্রথম দিন দেখেই। এমনভাবে অবাক হয়েছিলাম যে কয়েক মুহূর্ত দৃষ্টি ফিরিয়ে আনতে পারিনি ওর কাছ থেকে। চলতি পথে হঠাৎ থমকে গিয়ে সেই যে চাওয়া; ও-ও তাকিয়েছিল আমার দিকে। কতোক্ষণ। তারপর লজ্জায় কি-না জানি না, মুখ ঘুরিয়ে নিলো কোলের বাচ্চাটার ওপর। ওর কোলে ছোট্ট ফর্সা বাচ্চাটা তখন য়্যাঁ-য়্যাঁ করছে। মতিঝিল পাড়ায় সকাল দশটা, সময় অনেক হলো - ভেবেই অফিসের দিকে ছুট দিলাম।

অবশ্য এলাম, কিন্তু সেই মেয়েটার মুখটা ভুলতে পারলাম না। ঘুরেফিরে সেই মুখ।

একটি কিশোরী। ফর্সা বাচ্চা - য়্যাঁ-য়্যাঁ; ওরিয়েন্টাল প্লাজার সিঁড়ি - সেখানে বসেছিল মেয়েটা। আমার ধারণায় নিশ্চয়ই কোলের বাচ্চাটা সহোদর বোন-ভাই কিছু একটা হবে। ওর বসে থাকার ভঙ্গীটি ছিল এক রকম নিজেদের গৃহস্থলির দাওয়ায় বসে থাকার মতো। তবে প্রকৃতপক্ষেই ওটা আবাসিক কোন এ্যাপার্টমেন্ট ছিল না। মতিঝিলের অফিস প্লাজা। ওরিয়েন্টাল প্লাজা। ওখানেই লম্বা সিঁড়ির এক কোণে একটি কিশোরী, ভ্রুক্ষেপহীন, নির্লজ্জ-চুমু খায় নবজাতক ফর্সা মানুষটির ছোট্ট গালে। কোলের মধ্যে ময়লা ন্যাকড়ায় মোড়ানো গুটিগুটি মানুষটি আড়মোড়া দেয় পরম নিশ্চিন্তে ...

চিন্তায় ছেদ পড়ে। সহকর্মী মজিবরকে থাপ্পর পিঠ বরাবর।

- কিরে শালা ...
- এ্যাঁ।
- ধুম্ মেরে বসে আছিস যে? বিয়ে বাগাচ্ছিস নাকি?
- নারে ভাই।
- তাহলে অতোটা সাউন্ড-কোয়াইট? রোমান্টিক ভাবনা নাকি হে?
- আরে বাবা কিছু একটা ভাবলেই বুঝি বিয়ের কথা ভাবতে হবে হ্যাঁ। পৃথিবীতে আর কোন ভাবনা নেই?
- সরি। টেক ইট ইজি ম্যান। শোন্ তোকে আজও সেকেন্ড শিফ্‌ট কভার করতে হবে।
- মানে?
- হ্যাঁ। শিফ্‌ট সুপারভাইজারের নির্দেশ। কালকের কাগজে সাপলিমেন্টারি ইস্যু আছে, অতএব বুঝতেই পারছিস বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্লাম।

কেন না, রাত দুটো পর্যন্ত আমাকে একটানা কাজ করতে হবে।

মজিবর বললো -

- নিঃশ্বাস ফ্যালো আর যাই করো, ওভারটাইমের স্পেশাল রিকমেন্ডেশন দেখলে কিন্তু এই একটানা ডিউটি মোটেও গায়ে লাগবে না।

আরো কিছু খুচরো অফিসিয়াল কথা বলে মজিবর চলে গেলো। অতঃপর কাজে হাত দেই দৈনন্দিনকার মতো।

চাকরি করছি সেন্ট্রাল ঢাকার একটি প্রথম সারির দৈনিকে। পত্রিকার খবরা-খবর আর্টিক্যাল, প্রতিবেদন, যতোসব লেখালেখি যে মেশিনগুলোতে কম্পোজ হয়, সেই 'লাইনো-কাসটার' মেশিনের আমি একজন জুনিয়র মেকানিক। দিনের আঠারো ঘন্টাই চলে এই মেশিনগুলো। অপারেটররা কম্পোজে বসেন এখানে পালাক্রমে। রকমারী সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে চলে মেশিনগুলো -

ঝকর ঝকর, ঝর-র-র-টুংটাং।

এইসব সুবিধা-অসুবিধা দেখে রেখে একজন মেকানিক দায়িত্ব পালন করেন সময় নির্বিশেষে। এভাবে রাতজাগা গিনিপিগের মতো একদল ঊর্ধ্বশ্বাসপ্রবণ মানুষের ব্যস্ততা থেকে জন্ম নেয় পরের দিন একটি খবরের কাগজ। যার সারা শরীরে থাকে রাজ্যের খবর, পৃথিবীর এক মাথা থেকে অন্য মাথার সংশ্রব - বিশ্বটা যেন ক্রমান্বয়েই ছোট্ট শিশু ...।

ঘড়ির কাঁটায় রাত পৌনে দুটো। কাজ-কর্মও অনেকটা থিতিয়ে এসেছে। এবার বেরুবো বাসার দিকে। ঝুল-কালির হাত সাবানে ধুয়ে, মুখ-হাত মুছলাম। একটা সিগারেট এ সময় ক্লান্তির অবসান দ্যায়। আমার জামা-কাপড়ে লাইনো মেশিনের কালিঝুলি। একজন বয়লার শ্রমিকের মতই ক্লান্ত, হতচ্ছাড়া অবস্থায় রাস্তায় নেমে এলাম।

রাত এখন দুটো।

হাঁটছি আমি রাতের নিশাচর, অফিসফেরা জগলুল। জগলুল বললাম এ জন্য যে, এ কথাটার অর্থ আমি জানি না। তবে এ মুহূর্তে মানুষ যখন নিতান্তই ঘুমোয়, রাতের নীরবতা থাকে, থাকে বিষন্নতা অনুভবের, স্মৃতি রোমন্থন কিংবা অপেক্ষার করিডোরে সকালের জন্য - এ সবকিছুই খুইয়ে আমি এখন রাস্তায়, মধ্যরাতে অফিসফেরা যাত্রী - এজন্যেই কেন জানি নিজেকে একজন জগলুল মনে হলো।

মতিঝিলের এই প্রশান্ত রাস্তাটাকে এখন যে কেউ দেখলে চমকে যাবে। চওড়া পীচের বুকটা যেন লম্বা শ্বাস টেনে টেনে জিরোচ্ছে। এ মাথা থেকে তে-মাথা পর্যন্ত হা-হা ফাঁকা। এখন নেই রিক্‌শা-মোটর আর ট্রাক-বাসের দাপাদাপি। নেই ট্রাফিক জ্যামকে রক্ষা করার জন্য দায়িত্ববান সার্জেন্টের অনর্থক হোন্ডায় রম্ভকরণ প্রদর্শন। এতোসব বিহীন আমি এবং রাস্তাটা এই মধ্যরাতে পাশাপাশি চলছি।

একটি শিশুর কান্না শোনা গেল।

গ্রামের বিরাণ জনপদে এরকম শুনলে নির্ঘাত ভূত-প্রেতের মতোই মনে হতো। এতোক্ষনে আমি চলে এসেছি সকালকার সেই ওরিয়েন্টাল প্লাজার সামনে। আজ সকালে যে রকম চম্‌কে গিয়েছিলাম, এখনও দ্বিতীয়বারের মতো চম্‌কালাম আরো বেশী।

সেই মেয়েটি। গুটিগুটি, জবুথবু।

একটি অপরিস্কার ন্যাকড়ার মত বিছিয়ে কাত হয়ে শুয়ে আছে সে। বুকের কাছের নবজাতককে সান্ত্বনা দিচ্ছে। বাইরের নিয়ন বাতির অস্পষ্ট আলো তির্যকভাবে ওর মাথা থেকে বুক অব্দি ল্যাপ্টানো। ওর চারপাশ এবং মতিঝিলে এখন নিঃসীম নিস্তব্ধতা।

কেবলই স্তব্ধতার অসাড় রাতে এই অসহায় দৃশ্যটি আমার কাছে বীভৎস মনে হলো। ভাবলাম মানুষ কতো অসহায়। কি রকম অসহায় হলে এভাবে ঘরছাড়া, পরিবার ছাড়া এমন একাকীত্ব রাস্তায় আশ্রয় নিতে পারে। মনের ভেতর প্রশ্ন উঁকি দেয়। সঙ্গের বাচ্চাটা যদি ওর নবজাতক ভাই কিংবা বোনই হয় তবে মেয়েটার বাপ-মা-ই বা কে? তারা এ মুহূর্তে কোথায়? এরকম কাউকে দেখছিনাতো আশপাশে।

আমি এতোক্ষণে ওর সামনেটায় দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমার এই আকস্মিক দাঁড়ানো দেখে মেয়েটা খপ করে উঠে বসলো, চিতাবাঘ যেমন হঠাৎ উঠে বসে অনেকটা শব্দহীন বিচিন্তায়। আমার নাক বরাবর, একটি পনেরো বছর বয়স্কা কিশোরী আর একটি নবজাতক শিশু। দুপা সটান করে ছড়িয়ে বসলো মেয়েটি। পায়ের ওপর শিশুটিকে শুইয়ে দিলো। এদেশের গ্রামের অধিকাংশ মায়েরা এভাবে নবজাতক শিশুকে যেমন পরিচর্যায় মনোনিবেশ করে। আমি আরো কাছে এলাম ওর। একটু আগে যা ভেবেছি তাই প্রশ্ন করবো বলে স্থির করলাম কিন্তু তার আগেই মেয়েটা ঝাঁঝালো স্বরে বলে উঠলো,

- কোলের মধ্যে ছাওটা দেইখ্যাও তগো বুঝ অয় না?

কথার মাথামুন্ডু কিছুই বুঝলাম না, অনেকটা ঘাবড়ে গেলাম।

ততক্ষণে সে চিৎকার দিয়ে উঠলো,

- যা-যা কইতাছি। পোলাডা আমার মাত্রই চাইর দিন ধইরা অইছে। অহন - অহন তোরা আল্লার রস্তে আমারে একটু দয়া কর। এই সময় আমার শইলডা ভালা না ...।

নিস্তব্ধ রাতে মেয়েটার কথাগুলো মতিঝিলে প্রতিধ্বনিত হলো। ফিডব্যাক-টোনে একটি অসহায় আর্তি যেন ফিরে ফিরে আমার কানের মধ্যে এসে আছাড় খেলো। সমস্ত প্রশ্নের সমাধান ওর ঐ একটু আগের খেদোক্তির মধ্যে। যার কোন ব্যাখ্যা হয় না, হয়; তবে এই হওয়া মানেই নিষিদ্ধ কবিতার মত পাংশু। সমাজ বিকাশের ধারাবাহিকতায় অপাংক্তেয়।

ডাক দিলাম ওকে,

- এই মেয়ে

এতোক্ষণে সে সত্যিই যেন চমকে গেল। বললো,

- কে আফনে?

- তুমি আমাকে চিনবে না।

- হ। আফনের কালিমাখা শার্টকর্তা দেইখ্যা ভাবলাম মইতো - মতি। অই গ্যারেজে কাম করে; তাইতো বকতাছিলাম।

ওর কথায় ভালোমতো কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

- বাচ্চাটা কতদিন হয় হয়েছে?

- ছয়দিন আগে।

এরপর আমি ওর সম্ভব দূরত্বে বসলাম। ও আমার দিকে সন্দেহের তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। এরপর পরিবেশটা খুব একটা আলো-আঁধারিত থাকলেও মেয়েটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাটা আমার জন্য মোটেও অসুবিধা হয় না।

আমি দেখলাম একটি মসৃণ শ্যামবর্ণের প্রতিকৃতি। লম্বা, পিঠ জুড়ে চুলগুলো অগোছালো। কপাল একটা ছোট্ট মতো সাদা টিপ- সম্ভবতঃ খুব সখের আতিশয্য। গায়ে পুরনো প্রিন্টের কামিজের মতো, নিম্নাঙ্গে সারা রং ময়লা পাজামা। কিন্তু একজন মা হিসেবে ওকে এ মুহূর্তে মোটেও মানানসই লাগছে না। অথচ ওর কোলে লুকানো নবজাতক সন্তানটি ক্যামন নিশ্চিন্তে নিজের পাতলা ঠোঁট দুটি চাটছে আর চাটছে।

- ভরাট কণ্ঠে মেয়েটি প্রশ্ন ছুঁড়লো।

- আপনে ক্যাডায়, তাতো কইলেন না?

- আমাকে তুমি চিনবে না, আমি ঐদিকে পত্রিকা অফিসে কাজ করি।

- আইচ্ছা, তয় কাম করেন অফিসে কিন্তু রাইতের বেলা এই রাস্তাঘাটে ঘুরঘুর করতাছেন ক্যান?

না চমকে পারলাম না। বললাম,

- এখন অফিস ছুটি হয়েছে, বাসায় যাচ্ছি।

মেয়েটা হেসে উঠলো হি-হি করে। সন্দেহ ভরা ওর হাসির চিকন ধ্বনিটা বিদ্রুপের মতো ফিরে এলো।

- হি-হি ... বাসায় যাইবেন তো যান না ক্যান?

আমার রাগ হলো। কিন্তু চুপ থাকলাম। ও পুনরায় যে কথাগুলো বলতে লাগলো তা খুবই জঘন্য এবং লজ্জাকর ...।

তখুনি ধমক দিলাম জোরে। ও আমার ধমক মোটেও ভ্রুক্ষেপ করলো না। বরং প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলতে লাগলো,

- লইতায় অহন আর আসে না।

জিজ্ঞেস করলাম,

- লইতা কে?

ও ঠোঁট উল্টিয়ে বললো,

- কি জানি চিনি না, তয় এই রাইতের বেলায় সময়-গময় বুঝতো না - খালি আইতো। তাইতো মনে করছে পোলাডা বুঝি অর।

এরপর একটু হাসলো সে। পুনরায় বললো,

- আসলে হাচা কথা, পোলাডা যে কার আমি নিজেও জানি না।

- তাহলে এই বাচ্চাটা নিয়ে তুমি কি করবে?

মেয়েটা আমার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দিলো না। বরং হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে গেল।

- যান্ যান্ এইখান থন।

আমি একটুও নড়লাম না। ব্যাপারটা অন্যরকম হয়ে গেল। ও চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলো,

- শুয়োরের বাচ্চা। আমার চোখের সামনে থন যদি না যাবি, তয় এই ইটা দিয়া মাথা একদম গুইরা দিমু ...।

এবার প্রকৃতই ভয় পেয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে সে একটা আধাভাঙ্গা ইট হাতের চেটোয় তুলে নিয়েছে। পাগলের মত পুনরায় ধমকে উঠে সে ...

- গেলি! গেলি!!

অগত্যা দৌড়ে পালাতে হলো ওখান থেকে।

ঠিক এ সময় দূরে নাইট গার্ডের হুইসেল শোনা গেল। দুজন রাতের প্রহরীকে এদিকেই আসতে দেখা যাচ্ছে। আমি এখন আর এই পরিবেশটাকে নিরাপদ ভাবতে পারলাম না। এখন এই মেয়েটা আমাকে যে কোন রকম দূর্বিপাকে ফেলতে পারে ভেবে তখুনি ওখান থেকে পালাতে লাগলাম।

পেছনে তখনো মেয়েটার কথাগুলো খোদোক্তির মত আমার কানে আসছিলো,

- কুত্তার বাচ্চারা অহন জিগায় এই পোলাডারে নিয়া কি করমু। ক্যান, আগে যহন তগো দরজায় দরজায় যাইতাম, তহন তো কেউ কস নাই কেমনে বাঁচমু।

ওর কথাগুলো আর শুনতে পেলাম না। ততোক্ষণে আমি অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। লক্ষ্য বসুবাজার, যেখানে আমি থাকি।

দুই

বাসায় ফিরে বাকি রাতটুকু আর ঘুমাতে পারলাম না। নিত্যদিন বিছানায় যেভাবে শুই, আজও তাই করলাম। কিন্তু ঘুম এলো না। মাথাটা চিনচিন করতে থাকলো। অসাড় দেহে পড়ে রইলাম বিছানায়, কতোক্ষণ। অথচ একটু পরেই ঘটলো সেই ঘটনাটি, যেটি প্রসঙ্গতঃ বলাটা খুবই জরুরী।

আমি দেখলাম, সেই মেয়েটি - ওরিয়েন্টাল প্লাজা। কোত্থেকে যেন একটি স্পুট লাইট ওর মাথার ওপর এসে পড়েছে মঞ্চ নাটকের কায়দায়। কোলে নবজাতক সেই শিশুটি। নিশ্চিন্তে নিজের পাতলা টকটকে ঠোঁট দুটো চেটে চেটে একটি অপরিনত বয়স্ক মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি অনুভব করলাম একটি পনের বছরের কিশোরী জননীকে, যার মধ্যে এখনো পরিপক্ক হয়ে ওঠেনি সংবিধিবদ্ধ মাতৃত্ব; অথচ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওকে আগলে দিয়েছে একটি সতত প্রজন্মকে।

আমি ঘুমোতে পারলাম না। ঘুমের ব্যর্থ চেষ্টায় শুধু চোখের পাতা বন্ধ করে নিজের ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরলাম।

অস্বীকার করবো না। আমি স্পষ্ট দেখলাম একটি পৃথিবীকে। যেখানে অনেক মানুষ, মানী-জ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, ধনী-দরিদ্র, সুশোভিত মঞ্চ। একজন খদ্দর পাঞ্জাবী গায়ে, মাইক্রোফোনে গলা ফাটাচ্ছেন। অধিকার আদায়ের দৃপ্ত ভঙ্গিমায়, গরীব সর্বহারাদের বেঁচে থাকার পদ্ধতি নির্ধারণীর আহ্বান জানাচ্ছে। আমার চোখকে ফাঁকি দ্যায়নি, সেই পনেরো বছরের মেয়েটিও আছে সর্বহারাদের কাতারে। সব মানুষের জয়গানের মতো সেও শপথ নেয় দূর্গম সংগ্রামে। কণ্ঠে ওর হিপিনিটাস কোরাস বন্দনার অগ্নুৎপাত স্ফুলিঙ্গ।

তারপর বীভৎস দৃশ্যটি একটু পরেই দেখলাম আগের মতো স্পষ্ট। পৃথিবীটা উল্টে গেলো। মুচড়ে মুচড়ে পাল্টে গেলো অনেক কিছু ...। অনেকে টাল সামলাতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লো কুঁজো হয়ে। অধিকাংশেরই উঠবার জো নেই শিরদাঁড়া উঁচু করে। পৃথিবীটা তখনো কাঁপছে। কেঁপে কেঁপে এক সময় থামলো। থামতেই একদল দৌড়াচ্ছে। প্রত্যয়ঃ কার আগে কে যাবে। আগের মানুষরা আগেই অদৃশ্য। পড়ে রইলো একদল হাঁপিয়ে ওঠা মানুষ ... এবং এদের মধ্যে কোনাকুনি দাঁড়িয়ে পনেরো বছরের সেই অসহায়, অবৈধ মাতৃপ্রাণ মেয়েটিও।

মেজবাহ্ উদ্দিন জওহের

....

বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী

(বাকু ও মেজর নামের দুটি বালক আজ হতে ষাট বছর আগে গাজীপুরের এক গন্ডগ্রামে ঘুরে বেড়াতো। সে ছিল এক প্রাগৈতিহাসিক কাল। নীচের লেখাটি সেই প্রাগৈতিহাসিক বালকদ্বয়ের রোজ-নামচার সামান্য চিত্রকল্প)

এখন ঘোর বর্ষাকাল, কালিয়াকৈরের সাপ্তাহিক হাটের জায়গা পানিতে ডুবে গেছে। শ্রীফলতলীর জমিদার বাড়ীর পাশে টেম্পোরারিভাবে হাটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা বলি টানের হাট। প্রতি শুক্কুরবারে বসে। টানের হাট পারতপক্ষে আমি কামাই দেই না, কারণ সৈয়দপুর, লালটেকি প্রভৃতি বিখ্যাত স্থানের পাশ দিয়া ডিংগী নৌকায় চেপে হাটে যাওয়ার মজাই আলাদা।

বাচ্চু ভাইয়ের হাত ধরে হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, লোকের ভীড়ে হারিয়ে গেলে মুশকিল। একটা হালুই'র দোকানে থরে থরে রসগোল্লা, সন্দেশ, জিলাপী সাজানো। লোকেরা গোগ্রাসে মিঠাই খাচ্ছে। আমরা কিছু করি নাই, শুধু দেখছিলাম। হঠাৎ দোকানের ভেতর থেকে একজন লোক আমাদের দিকে তেড়ে আসে - 'এই ছেমড়ারা, ভাগলি এখান থেইক্যা। যা ভাগ্ ....।

তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। বাচ্চু ভাই বলে - হালার মালাউনের বাচ্চা। আমরা কি তগো মিঠাইতে হাত দিছিলাম। র', বড় অইয়া নই। চাকরি কইরা যহন টেকা কামামু, ভাত খামু না, তিন বেলাই রসগোল্লা খামু। আমার পকেটে চারটি পয়সা আছে, সাহেবালী কাক্কু দিয়েছেন। কাক্কু কল দিয়া লুংগী সেলাই করেন, খলীফা। হাটের দিন তার ব্যস্ততা অনেক, চারটি পয়সা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বিদায় করেছেন। এই পয়সা দিয়ে গেন্ডারী কিনব, না মিঠাই কিনব - মনস্থির করতে পারছিলাম না। বাচ্চু ভাই বললেন - চাইর পয়সায় মাত্র একটা রসগোল্লা দিব। আর গেন্ডারী মাইনষে কিনা খায়? দক্ষিণ পাড়ার ঘটু জোলার ক্ষেতে কি ভাল গেন্ডারী অইছে, লোহা ডাং না - ঘিওর। আইজ রাইতেই চুরি করুম। তরে দিমুনে। অহন নে যাই টানা কিনি, তিলা টানা। চাইর পয়সায় অনেকখানি পাওয়া যাইব।

টানা গুড়ের তৈরী মিষ্টান্ন, উপরে তিলের ছাট দেয়া। বড়ই সুস্বাদু জিনিস, চার পয়সায় অনেকটুকু মিলল। দুইভাই নিবিষ্ট মনে খাচ্ছিলাম। এমন সময় "চাই বিড়ি মেচ" - বলে কানের কাছে কে যেন চেঁচিয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি বাচ্চু ভাইয়ের বয়েসী একটা ছেলে একটা টিনের চুঙ্গা দিয়ে চেঁচিয়ে বিড়ি ও ম্যাচ বিক্রি করছে। 'গাদিলা' পাতার বিড়ি। ছেলেটির পোষাক আশাক ভাল, পরণে হাফ প্যান্ট, গায়ে সার্টও আছে। এমন একটা ছেলে হাটে ঘুরে ঘুরে বিড়ি-ম্যাচ বিক্রি করছে, বড়ই আশ্চর্য্য।

বাচ্চু ভাই বলল - 'ও বাইনার পোলা। ছোটকাল থেইকাই ব্যবসা শিখতেছে। খোঁজ নিয়া দ্যাখ, অর বাপে আমাগো হাবেজুদ্দি সরকারের থেইক্কাও ধনী। ইস্, আমার যুদি একটা টেকা থাকত, আমিও বিড়ি-ম্যাচের দোকান দিতাম।

আমি বললাম - 'বিড়ি ম্যাচের দোকানে খুব লাভ, তাই না বাচ্চু ভাই?'

লাভ মানে! লাভের উপর লাভ। এক টেকার বিড়ি ম্যাচ তুই কম কইরা অইলেও দেড় টাকায় বিক্রি করতে পারবি। আবার হেই দেড় টেকা দিয়া মাল কিনা আবার বেচবি। এক মাস যুদি এইভাবে বেচতে পারস, টেকায় লাল অই যাবি। হিন্দুরা তো এইভাবে ব্যবসা কইরা ধনী অয়। আমাগো পুব বাড়ীর মহি'র মা বিড়ি-ম্যাচ, নালি আর কেরুসিন তেলের দোকান দিছে। মহি'রা অখন আর গরীব নাই, সামনের বার নাকি মহি আর কারও বাড়ীতে চাকর থাকবো না।'

কথাটা সত্য। পুব বাড়ীর গেন্দু দেওয়ান হদ্দ গরীব। বছরের অধিকাংশ সময়ই না খেয়ে থাকে, মহি মাসিক চার টাকা বেতনে সারা বছর মানুষের বাড়ীতে চাকর খাটে। ব্যবসার বদৌলতে সেই মহি'রা ধনী হয়ে গেল, আর আমরা এভাবে পড়ে থাকব? আমি বললাম - 'দোকান তো দিবা, কিন্তু টেকা পাইবা কই?'

পয়সা না, আধলি না, একেবারে গোটা একটা টেকা!

বাচ্চু ভাই আগ্রহের সাথে বললেন - 'তুই জোগার কর ম্যাজের। তর বেচন লাগব না, কিচ্ছু করণ লাগব না। আমিই বেচুম। তুই আমার পিছে পিছে থাকবি, তরে লাভের অর্ধেক ভাগ দিমু।

লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু আমি টাকা পাই কই? বাচ্চু ভাইই উপায় বাতলিয়ে দিলেন - চাচীর কাছে চাবি, খুব কান্দাকাটি করবি। কিন্তু সাবধান, দোকানের কথা কবি না। নইলে কিন্তু এক পয়সাও দিব না। আরও একটা পথ আছে। চাচা যহন কাচারী থন বাড়ীতে আহে, পকেট বোঝাই পয়সা থাকে। চুপ কইরা চাচার পকেট থেইকা একটা কইরা সিকি নিয়া উগারের বাঁশের কোটরে ফেলবি। চাইরদিন জমাইলে এক টেকা অইয়া যাইব।

উপায়টা মন্দ না, তবে বড় রিস্কি। ধরা পড়লে মাইরা হাড় গুড়া করব। সুতরাং বললাম - আরও একটা উপায় আছে বাচ্চু ভাই। মজ্জেমের কোমরের বাইটার মধ্যে অনেক টেকা পয়সা আছে। কুনভাবে যুদি বাইটা ছিড়া পয়সাগুলা নেওন যায় ...।

দূর বোকা। অই কয়টা টেরা পয়সা দিয়া কি অইব? ষোল পয়সা অইলে মাত্র অইব চাইর আনা ...।

বাচ্চু ভাইর প্রস্তাবটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে থাকে। একটা টেকা যোগাড় করতে পারলেই কেল্লাফতে, যতখুশী রসগোল্লা খাও, যতখুশী বরফি খাও। টানা ছরি এইসব গরীব মাইনষের মিষ্টির ধারে কাছেও যেতে হবে না।

বাচ্চু ভাইর পার্থিব সব বিষয়েই আমার চেয়ে উপরে। মাছ মারা, হাল বাওয়া বা অন্যান্য কাজকর্মে বড়দের মতোই ওস্তাদ। গুটু খেলায় (হাডুডু) তার পাঁচ গায়ে সুনাম। অথচ সেই তিনিই আমাকে ইদানিং তোয়াজ করে চলেন। উদ্দেশ্য একটাই, যদি কোনভাবে তার বিজিনেসের ক্যাপিটাল বাবদ একটা টেকা যোগাড় করে দিতে পারি।

সেদিন রাতে আমাকে বললেন - এ্যাই ম্যাজের, শিগগীর আয় ...।

বিষয়টা কি, তাড়াতাড়ি তার পিছু নেই আমি। আমাকে ডিংগীতে চড়িয়ে লগি মেরে বিলের দিকে রওনা দিলেন তিনি। বিলের কিনারে একটা আমন খেতে তার নৌকা থামল। মাচাইল উঠাতেই আমার চক্ষু চড়কগাছ, সেখানে এক বোঝা কুশাইল। আজে বাজে কুশাইল না, খাটি মিছিরি দানা। এর একটা গেন্ডারী খেলে 'কইলজা' ঠান্ডা হয়ে যায়, সেখানে কিনা এক বোঝা।

বাচ্চু ভাই বললেন - ঘটুগো ক্ষেত থেইকা কাটছি। কাইল আমারে কয় - এ্যাই, খেতের আশে পাশে ঘুর ঘুর করস ক্যান? কুশাইলে আত দিবি তো মাইরা হাত পাও পেটের ভিতর হান্দাইয়া দিমু। হালা ..., অহন দে হান্দাইয়া, এক বোঝা কাটছি।

- এত কুশাইল দিয়া কি করবা ভাই?

- খামু, যে কয়ডা পারি অহন খামু। বাকীগুলা আমন খেতে লুকাইয়া রাখুম। রোজ সন্ধ্যার পর আইসা খামু। গেদির লাইগা দুই চাইরডা নিতে মন চায়, কিন্তু নেওন যাইব না। বাড়ীতে নিলে হাড্ডি গুড়া কইরা ফালাইব। সুতরাং দু'ভাইয়ে মিলে মহাসুখে গেন্ডারী চিবুতে থাকি। খাওয়ার এক ফাঁকে তিনি বললেন - টেকার কি করলি?

- মা দেয় না, কয় টেকা কি গাছের গুটা যে চাইলেই পাওয়া যায়? বাজানে কবে বাড়ীতে আইব ঠিক আছে?

বাচ্চু বললেন - দুইদিন কামলা দিলেই এক টেকা অইয়া যায়। আমি বড়দের সমানই কাম করতে পারি, আমারে নইলে আট আনা কইরা রোজ দিল।

- তুমি কামলা দিবা!

- না, কইলাম আর কি। কামলা দিবার গেলে রক্ষা আছে, মাইরা হাড্ডি গুড়া গুড়া কইরা দিব না। আচ্ছা তুই ক দেহি, লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে দুইচাইর দিন কামলা দিলে ক্ষতি কি?

অবশেষে টাকার জোগাড় হয়ে গেল। আমার কাছে চার আনা পয়সা ছিল। অনেকটা অলৌকিকভাবে আরও আট আনা পয়সা হাতে এসে গেল। পশ্চিম বাড়ীর কিয়ামুদ্দিন সরকার আমার বড় মামা। খুব বড়লোক। বজরা

নৌকায় চলাফেরা করেন। তার ছোট ছেলে সাচ্চা মিঞা পাড়ার যুবকদের ইর্ষার স্থল। লাক্স সাবান দিয়া গোসল করেন এবং সিল্কের লুংগী পড়েন। সাচ্চা ভাইর চুলগুলি খুব সুন্দর, কালো কুচকুচে কোঁড়ানো একমাথা চুল। তিনি আমাকে খুব আদর করেন। আমি প্রায়ই তার কাছে যাই এবং তার হাত পা টিপে দেই। আমার সমস্যার কথা শুনে তিনি সেদিন হাসতে হাসতে আমাকে গোটা একটা আধূলী দিয়ে বললেন - নে ধর, দোকান দিলে রোজ আমারে এক প্যাকেট কইরা বিড়ি দিবি।

আমি অবাক। সাচ্চা ভাই বড়লোক মানুষ, বগলা সিগারেট খায়। তাইনে গাদিলা পাতার বিড়ি খাবেন, ইডা কেমুন কথা। আমার বিস্ময় দেখে তিনি বললেন - তর দোকান থেইকা আমি জিনিস না কিনলে দোকান চলব কেমনে? আমি না খাই, কামলাগো দিমু। তয় রোজ এক প্যাকেট আমার কাছে বেচবি, বুঝলি?

এই না হলে বড়লোক। দিলটা যেন আকাশের মতো। এক কথায় মানুষকে গোটা একটা আধূলি দিয়ে দিতে পারে! খুশীতে লাফাতে লাফাতে বাচ্চু ভাইর খোঁজ করি। আমার কাছে বারো আনা আছে। আর চার আনা হলেই ব্যবসা স্টার্ট করা যায়। এমন আনন্দের মুহূর্ত মানুষের জীবনে কমই আসে।

মহাসমারোহে আমাদের বিজনেস শুরু হয়ে গেল। চকির নীচে বহুদিনের পুরাণো একটা ভাংগা টিনের তোরঙ্গ আপাততঃ আমাদের শপ কাম গোডাউন। বিড়ির বান্ডিল ও ম্যাচগুলি সেখানে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখা হলো। পোলাপানে যেন কোনভাবেই সেটা খুলে জিনিসপত্র তছনছ করতে না পারে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। মার্কেটিংয়ের বিষয়েও আলোচনা হলো। মহি'র মা চার পয়সায় চারটা বিড়ি ও একটা ফাও দেয়। আমরা ঠিক করলাম 'আমরা দুইটা ফাও দেব - চার পয়সায় ছয়টা বিড়ি।' মার্কেট হাতে রাখতে এ ছাড়া কোন উপায় নাই। প্রথম প্রথম বেশী লাভ হবে না, তবে মার্কেট একবার কবজায় এসে গেলে তখন ...। বাচ্চু ভাই বললেন - বাজান কইছে, আমারে একটা তোড়া বানাইয়া দিব। তোড়াডা পাইলে আর কোন সমস্যা নাই। কোমরে শক্ত কইরা বাইন্দা রাখুম। অখন পয়সাপাতি কোমরে তপনের লগে গুইজা রাখলেই চলব। মাত্র তো কয়ডা দিন। আর হ্যাঁ, সারাদিন যা বিক্রি অইব তার পয়সা সব আমার কাছে থাকব। সাবধান, তুই পয়সা নিয়া ঘুরবি না। তুই ভ্যাবলা, হারাইয়া ফেলবি।

প্রথমে বেচা বিক্রি তেমন হয় না, আমাদের দোকানের কথা অনেকেই জানে না। সারাদিন হা করে বসে থাকি - এই বুঝি কেউ বিড়ি কিনতে আসল। কিন্তু না, দেখি অন্য কোন ফালতু কামে এসেছে। পৃথিবীতে বিড়ি কেনার চাইতে জরুরী আর কোন কাম আছে?

ঘনিষ্ট মহলে বিড়ির ক্যানভাসে লেগে যাই। নুরু, হবি, মজু, দেলু, লোকমান, সিরাজ সবাইকে বলে দেই যেন তারা কখনও বিড়ি টিরি মহি'র মা' দোকান থেকে না কিনে। মহি'র মার চেয়ে আমরা পরিমানে বেশী দেই। ব্যবসাতে লাভ হলে আমরা একটা চামড়ার বল কিনব। সবাই খেলতে পারবে। মহি'র মা হাজার লাভ করলেও বল কেন একটা জাম্বুরাও কিনে দেবে না। এমতাবস্থায় নিজের স্বার্থেই তাদের আমাদের সহযোগিতা করা উচিত। সবাই একবাক্যে আমাদের সমর্থন করলো, তবুও বিক্রি-বাট্টা তেমন হচ্ছে না।

বাচ্চু ভাই আশ্বাস দিয়ে বলল - চিন্তার কিছু নাই, ব্যবসা দাঁড়াইতে সময় লাগে। একটা কাপড়ের 'থইলা' জোগাড় করতে পারলে আর তোড়াডা পাইলে আমরা হাটে গিয়া বেচতে শুরু করুম। কিছু পয়সা অইলে বিড়ির সাথে বাতাসা আর টানা রাখুম। লাভও অইব মনের আশ মিটাইয়া খাওন যাইব, বুঝলি।

সবাই বলে থাকেন যে নিষ্ঠার সাথে লেগে থাকলে সফলতা আসেই। আমি তাদের কথার বিরুদ্ধাচরণ করতে চাই না, তবে একটা কথা যোগ করতে চাই। শুধু নিষ্ঠা থাকলেই সাধন হয় না, সেই সাথে ভাগ্যেও থাকতে হয়। নইলে দেখুন না, সেদিনের সেই উদ্যমী বালক দুটির নিষ্ঠার কোন ঘাটতি ছিল না। অথচ ভাগ্যের প্যাঁচে তাদের এমন রমরমা ব্যবসাটা লাটে উঠল। দুই হাত দিয়ে রসগোল্লা-সন্দেশ খাওয়ার ইচ্ছা পুরণ হলো না, বড়োই আফসোস।

তখন ছিল ভরা বর্ষাকাল, পানিতে ভীষণ ধার। একটা তালের ডোঙ্গায় চড়ে বাচ্চু ভাই পশ্চিম বাড়ীর ফুটকা ভাইদের বাড়ী যাচ্ছিলেন। ডোঙ্গা খুবই টালমাটাল বাহন। একটু ইমব্যালান্স হলে যে কোন সময় তা উল্টে যায়। বাচ্চু ভাই পাকা মাঝি, তার হাতে ডোঙ্গাও পংখীরাজের মতো উড়ে চলে। অথচ তার হাতেই ডোঙ্গাটা মাঝ গাংগে উল্টে গেল। এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আল্লাহর দুইনায় আর কি আছে?

ডোঙ্গা উল্টে যাওয়া কোন বিষয় না, এটি যে কোন সময় ঘটতেই পারে। মর্মান্তিক বিষয় হলো ভাইয়ের লুংগীটি। সাতরে ডোংগাটা সোজা করার প্রচেষ্টার কখন যে তার কোমর হতে তপনটি মুক্ত হয়ে বর্ষার প্রচন্ড স্রোতে গা ভাসিয়েছে তিনি টেরও পাননি। তপনের গোঁজে আমাদের ব্যবসার সমুদয় মূলধন গিটঠু মারা ছিল। ডোংগা সোজা করে তিনি যখন তাতে উঠে বসলেন, তখনই শুধু তিনি বুঝতে পারলেন যে নিমক হারাম তপন আমাদের সর্বস্ব নিয়ে ডুব মেরেছে, তার পরণে এখন নির্ভেজাল জন্মদিনের পোষাক।

- ওরে বাবারে আমার কি সর্বনাশ অইলো রে, ওরে বাবারে একি সর্বনাশ অইলো ..।

বারে বছরের কিশোরের সেই মর্মান্তিক আহাজারি শুনে সেদিন সবাই হেসে কুটপাট। বাচ্চু ভাইর কান্নার শব্দ আজও ভেসে বেড়ায়, আমি কান পাতলেই তা শুনতে পাই।

হাবিবুর রহমান

....

সর্বনাশের সকাল বেলা

তাড়াতাড়ি শুয়ে পড় সবাই। কাল খুব ভোর উঠতে হবে। আমাদের তাড়া দিল বুড়ী।

তথাস্তু!

বলে আমরা বিছানার আশ্রয় নিলাম। শব্দ দূষণের অনেক আগে ফজরের আযান বাতাসে মিলিয়ে না যেতেই আবার বুড়ীর তাড়া।

উঠো উঠো সবাই। এ্যায় স্বাতী, এ্যায় শুভ। উঠো।

এই কাক ডাকা ভোরে কেন চেঁচামেটি শুরু করলে বলতো! ঘুম জড়ানো কণ্ঠে উস্মার আবেশ। ঘুম কাতুরে স্বাতীর ঘুমের বিচিত্র তরিকা। আধা রাত ঘুমায় সে নিজের বিছানায়। বাকী রাত কিছুটা আমাদের রুমে, কিছুটা শুভর রুমে। কখনো দেখা যায় ডাইনিং টেবিলে মাথা রেখে দিব্যি ঘুমুচ্ছে চেয়ারে বসে। এহেন বিচিত্র ঘুমের রাজ্যে হঠাৎ বুড়ীর চেঁচামেচি বিরক্তির উদ্রেক করাটাই স্বাভাবিক। ঝড়ের গতিতে আমাকে ধাক্কা দিয়ে সে বললো : আজ কয় তারিখ মনে আছে?

আড়মোড়া ভেঙ্গে চোখ কচলাতে কচলাতে আধবোজা চোখের তেরছা কোণায় জিজ্ঞাসা ফুটিয়ে ওর দিকে তাকাতেই বললো : আজ ১লা বৈশাখ।

"ও !" বলে লাফ দিতে গিয়ে ওর গলা জড়িয়ে বিছানায় কুপোকাত। "ছাড়ো" বলে ঝটকা মেরে গলার বেড়ি ছাড়িয়ে বললো : গেট রেডি।

থুড়ি ! আজ ইংরেজী বলবো না। ১লা বৈশাখ বলে কথা।

ততক্ষণে আমার কন্যা পুত্রের দু'জোড়া চোখ দরজায় সার্চলাইট জ্বালিয়ে দিল। তাড়াতাড়ি বেরুতে যেয়ে ওদের তাড়া দিলাম।

আমরা যখন রমনা বটমূলে পৌঁছলাম চৌদিক থেকে তখন লোকজন জড়ো হচ্ছে। লাল পেড়ে গরদের শাড়ী, গলায়, খোঁপায় বেলীর মালা, পাজামা পাঞ্জাবী পড়া সুবেশী তরুণ তরুণী, ছোট বড়রা নয়নতারায় স্নিগ্ধ সুন্দরের নরম ভাললাগা জড়িয়ে দিল। হঠাৎ মনে হলো প্রয়োজনে যখন যে বেশ ধরিনা কেন আদতে আমরা খাঁটি বাঙ্গালী। ছোট মেয়েটিও শাড়ী পড়েছে, ছেলেটিও পাজামা পাঞ্জাবী শোভিত। নন্দিত দৃশ্যে দৃষ্টিতে তখন কুসুমিত আনন্দ। "সুদর্শন উড়িতেছে দেখো।"

এ্যায় দেখতো ওরা আসছে কিনা?

কারা?

খুকুরা। আজ মিষ্টি গাইবে।

মিষ্টি ! খুকুর বড় মেয়ে।

হ্যাঁ গো ! মিষ্টি সলোও গাইবে। ছায়ানট ওকে লিফট দিচ্ছে। গলা ভালতো তাই।

আবারো তুমি ইংরেজী বললে? আমার খোঁচা গায়ে না মেখে বললো।

এ সব শব্দ এখন বাংলা হয়ে গেছে। বুঝলে বিদেশী শব্দ না এলে ভাষা সমৃদ্ধ হবে কি করে এ্যাঁ?

জ্ঞান দিয়ো না। বাংলা আমি বুঝি।

কচু।

মা! থামবে। ঐ দেখো ওরা এসে গেছে।

স্বাতীর গলা।

চাইনিজ হোটেলের ওদিক থেকে দুই কন্যাও স্বামীর সাথে খুকুর হাসিমুখ উঁকি দিল। আমরা শান বাঁধানো প্রাচীন বটের পিছনের দিকে জায়গা করে নিলাম। স্বাতীরা মঞ্চের সামনে বসলো। মিষ্টি মঞ্চে। ওদের আনন্দ ধরে না। খুকুর ছোট মেয়েটা দৌড়ে এসে জানান দিল।
মা, দিদি উপরে বসেছে।
হেসে ইশারায় মেয়েকে বিদায় করে খুকু মন দিল আড্ডায়। আমার তৃষ্ণার্ত প্রবাসী চোখ দুটি খুঁজছে পরিচিত জনদের। যদি কেউ নজরে পরে। কাজী আরিফকে সাথে নিয়ে প্রজ্ঞা লাবনী এগিয়ে আসছে। আমাদের দিকে পিছন দিয়ে বাঁয়ে বসে আছেন সনজিদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হক। অনেক দিন পর দেখলাম। ওয়াহিদুল হক বুড়িয়ে গেছেন। “জনকণ্ঠে” এঁর কলাম পড়ে বুঝা যায় না এই কলামিষ্ট ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এতোটা বয়সী। দীর্ঘ পাঞ্জাবীর ভেতর থেকে উঁকি দিল কালো সারসের মত শিমুল মোস্তফার গলা। আমার চোখ খুঁজছে আসাদুজ্জামান নূরকে। নাহ্। এখনো আসেননি তিনি। মিনি সূর্যটাকে ললাটে ধারণ করে ঘামতে ঘামতে এলেন মিতা হক। তাঁর পিছনে তাপ্পি মারা রংচংগা পাঞ্জাবী পরিহিত স্বর্ণকান্তি হাসান ইমাম এলেন শিশুহাসি ঠোঁটে মেখে। সমবেত কণ্ঠে “এসো হে বৈশাখ এসো এসো ...” দিয়ে শুরু হয়ে গেল ছায়ানটের ঐতিহ্যবাহী বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। আমার ছোট্ট ক্যামেরাটি নিয়ে উঠে গেলাম মঞ্চের দিকে। মোটা দঁড়ি টানিয়ে বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছে। বেষ্টনী ভেদ করে ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করতেই একজন স্বেচ্ছাসেবক বাঁধা দিলেন। প্রবাসে লেখালেখি করি। রিয়াদ ডেইলীর বাংলা বিনোদনের নিয়মিত লেখক। এতোসব বলেও চিড়া ভিজলো না। অতঃপর ব্যাক টু দি প্যাভিলিয়ন। আবার আড্ডা। তবে নূর এলে আমি তার ছবি তুলবোই। নিরাপত্তা বেষ্টনী যত শক্তই হোক। মনে মনে মনকলা খাওয়ার মত প্রতিজ্ঞা করে জায়গায় গিয়ে বসলাম। কথার চুলচেরা চিরুনী দিয়ে ঠাস বিনুনী বাঁধছে বুড়ী ও খুকু। মুগ্ধ শ্রোতার মত গিলছে মানিক দা।

জানো খুকু! আমার শ্বশুড়বাড়ী গাঁয়ে। বলতে পার অজপাঁড়াগা। যদিও রাজধানী থেকে মাত্র ২৪ মাইল দূরে। কিন্তু ঢাকা থেকে আমার শ্বশুড়বাড়ী যেতে সময় লাগে প্রায় আট ঘন্টা। ভাবতে পার। বিয়ের পর কিছুটা লঞ্চে, কিছুটা নৌকায় এবং বাকীটা পালকিতে চড়ে পৌঁছলাম শ্বশুড় বাড়ী। রাত বেশ হয়েছে। হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে বাড়ী আলোকিত করা হয়েছে। আমি যাওয়ার আগে একটা রিকসাও ছিল না ও তল্লাটে। বিজলী বাতিতো দূরের কথা।

তুমি বলতে চাও যে তোমার বিয়ের পরই দোহার থানার উন্নতি হয়েছে?
অবশ্যই।
তার মানে তুমি বউ হয়ে না গেলে ওখানে উন্নতির ছোঁয়া লাগতো না। প্রদীপের নীচে অন্ধকারের মতই থেকে যেতো ও এলাকা?
বুঝতে হবে না ছোঁয়াটা লেগেছে কার। অবশ্য তুমি ও বাড়ীর বউ হয়ে গেলে উন্নতিটা অন্যরকম ও হতে পারতো।
খোঁচাটা গায়ে না মেখে খুকু বললো - বলে যাও, থেমো না।
বুঝলে, সেই যমানায়ও আমার মা মানে আমার শ্বাশুড়ী নববর্ষ উপলক্ষ্যে বাড়ীঘর পরিস্কার করতেন, জামা কাপড় ধুয়ে সব কিছু ঝক্মক্ ফিটফাট করে তুলতেন। জানো, নববর্ষের প্রথম দিনের পুরোটা সময় আমার মা আমাকে পড়ার টেবিলে বসিয়ে রাখতেন, তাঁর ধারণা আজকে পড়লে সারা বছর আমি ভাল করে মনযোগ দিয়ে পড়বো। চৈত্র সংক্রান্তিতে আমাদের দেশে ঘোর দৌড় হতো। ষাড়ের লড়াই হতো। ষাড়গুলিকে কৃষকরা ভাংয়ের শরবত খাওয়ায়ে আনতো। তারপর শুরু হতো লড়াই। মত্ত ষাড়ের লড়াই এক ভয়ানক খেলা। আমরা ছোটরা বাবা বা কাকাদের হাত ধরে শংকিত চিত্তে অধীর আগ্রহে খেলা দেখতাম।

আমাকে থামিয়ে দিয়ে বুড়ীর বয়ান শুরু হলো আবার।

আমার বাপেরবাড়ী জামালপুর শহরে। জামালপুরটা হলো হিন্দু অধ্যুষিত শহর। আমার আব্বার অনেক হিন্দু বন্ধু ছিল। আব্বা ব্যবসা, বাণিজ্য, উঠা, বসা, হিন্দুদের সাথেই করতেন। আব্বার এবং কাকার মৃত্যুর পর আজো আমাদের দুই পরিবারে আসা যাওয়া, খাওয়া দাওয়ার সব রকমের সম্পর্কই আছে। ১লা বৈশাখ। আমরা বলতাম হাল খাতার দিন। বিকালে আব্বার হাত ধরে হাল খাতায় যেতাম। প্রচুর মিষ্টি খেতাম। মিষ্টির সিরায় বাংগীর টুকরা চুবিয়ে চুবিয়ে খেতাম।

এতো বাংগী খেয়ে তোমারতো মোটা হয়ে যাওয়ার কথা বুড়ী। কিন্তু এ রকম স্লিম ফিগার রাখলে ক্যামনে?
না রাখলে তো তোমার দিকে হাত বাড়াতো আমার বর ! আমার চারপাশে মানিক খেজুর কাঁটার বেড়া দিয়ে রেখেছে। কাঁটা বিঁধে রক্ত ঝরাতো।

"আব্বু আসাদুজ্জামান নূর আবৃত্তি করবেন।" শুভ দৌড়ে খবর দিল। ক্যামেরাটা নিয়ে উঠে গেলাম আবার। হাতে একটি "বহুমাত্রিক"। সাইজে ছোট হওয়ার কারণে বুড়ী সবসময় ব্যাগে রাখে এটা। পরিচয়ের সাথে সাথে আত্মপ্রশংসার পানি ঢেলে চিড়ে ভিজিয়ে ফেললাম স্বেচ্ছাসেবক ভাইয়ের। মঞ্চের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে ফটাফট কটি স্নাপ নিলাম। পিছনে চিৎকার শুরুর আগেই কেটে পড়লাম। আসরে ফিরে না গিয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। পান্তার ষ্টলগুলি এবার বেশ দূরে রাস্তার দুপাশে বসেছে। অদূরে শিশু পার্কের সামনে ঋষিজ শিল্পীগোষ্ঠীর মঞ্চ। ফকির আলমগীরের কণ্ঠ ভেসে আসছে। সোহরাওয়ার্দী উদ্যান আড়াআড়ি পাড়ি দিয়ে ওপারে গেলে শিশু একাডেমীর অনুষ্ঠান, বাংলা একাডেমী, টি.এস.সি ছাড়িয়ে আর একটু সামনে গেলে চারুকলা ইনষ্টিটিউটের বকুল বেদীতে চলছে আর এক জমজমাট অনুষ্ঠান। ভেতরের অডিটোরিয়ামে দেখানো হচ্ছে "চিত্রা নদীর পাড়ে" সিনেমাটি। ভেতরের কাউন্টার থেকে আটটি টিকেন কিনলাম। দুপুরে "রাঁধুনীতে" ইলিশ পোলাও খেয়ে তিনটার শো দেখবো। পুরো রমনা এলাকা নববর্ষের আনন্দ মেলায় পরিণত হয়েছে। মনে হয় ঢাকা শহরে কোন মধ্যবিত্ত পরিবার আজ আর ঘরে নেই। সবাই বেরিয়ে পড়েছে। আবার ফিরে এলাম রমনা পার্কের বটমূলে। ওদের কাছে ফিরে আসতেই সবাই হৈ চৈ করে উঠলো এক সাথে। কোথায় ছিলে এতোক্ষণ? স্বাতী বললো তাড়াতাড়ি এসো। মিষ্টি গান গাইবে। আমরা সবাই মঞ্চের কোনায় এসে দাঁড়ালাম। মিষ্টি গাইলো। আমরা মনযোগ দিয়ে শুনলাম। কণ্ঠের কারুকাজের কমতি আছে। কিন্তু গলাটা ভারী মিষ্টি।

ওকে ভাল ওস্তাদ রেখে গান শিখা খুকু। ছায়ানটে ক্লাশ করছে। বাসায় শিখা শিখাচ্ছে। শিখাদি ভাল টিচার। তবে আরো অনুশীলনের প্রয়োজন আছে। তুই খেয়াল রাখিস।
স্বাতী তুই গান ছেড়ে দিলি কেন? এতো মিষ্টি গলা তোর।
আন্টি, সবাই গাইলে শুনবে কে? মিষ্টি গাইবে আমি শুনবো। মজাই আলাদা।
মেয়ে কথা শিখেছে?
আসলে কি জানো আন্টি। এই বিবিএ পড়াটা বেশ কঠিন। ভার্সিটি থেকে ফেরার পর অন্য কিছু করতে ইচ্ছা করেনা। তাই আস্তে আস্তে অভ্যাসটা চলে গেছে। রাগ করোনা, প্লিজ।
স্বাতীর কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো। আমরা সবাই পূর্বস্থানে ফিরে এলাম। বেশ রোদ উঠেছে। ভোরে যদিও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি ছিল। এখন বেশ গরম। সকালে নাস্তা কারোরই হয়নি। কাক ডাকা ভোরে কি করেই বা নাস্তা করা যায়।
ক্ষিদে পেয়েছে।
আমার কথায় মৌন সম্মতি জানালো সবাই। কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত উঠা যাবে না। লেকের ভেতর লাল শাপলা ফুটে আছে। বটমূল ছুঁয়ে কালাপানি তিরতির করছে। পদ্মপাতা দুলছে মন্থর বাতাসে। মনের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠছে "ওরে বিহঙ্গ নারে বিহঙ্গ/এখনই অন্ধ বন্ধ করো না পাখা।" সবে সকাল। আমার ভেতর সন্ধ্যা কেন গুনগুনায়।
এবার লেকে লাশ নেই।
মানে?
দেখো না ফি বছর এই দিনটায় কেউ না কেউ লেকের পানিতে ডুবে মরে। এবার মরেনি। মরলে ভাল হতো।
কথার কি ছিরি!
লেকের কালো জল। মাঝে মাঝে লাল পদ্ম ও শাপলা জড়াজড়ি করে ফুটে আছে। এই থৈ থৈ পানিতে যদি একটি শাদা লাশ ভেসে থাকতো কি ভয়ংকর সুন্দরই না দেখাতো ! কি বলো?
চুপ কর খোকন ভাই!
খুকু চিৎকার করে উঠলো।
বছরের প্রথম দিনটার কি অলক্ষুণে কথা।
আহা! চার হাত পা ছড়িয়ে লাশটি চিত হয়ে ভেসে আছে। পানিপোকা কেঁদে ফিরছে চারপাশে। কালো ভ্রমর মুখে বসছে-উড়ছে।

কি ভয়াবহ নিসর্গ শোভা!

সাট আ-প। মানিকদা গর্জে উঠলো। এ নিপাট ভদ্রলোকের গর্জে উঠাটা উপভোগ করতে না করতেই বোমা ফাটার গগনবিদারী আওয়াজ। টপ্ করে শুয়ে লেকের দিকে গড়িয়ে গেলাম। কারো কথা মনে রইলো না। আওয়াজের পর আওয়াজ। ভয়াবহ বিকট শব্দ। আধা শরীর পানিতে ডুবিয়ে দেখছি চারদিক ধোঁয়ায় ছেয়ে গ্যাছে। আকাশের দিকে কি সব টুকরো উঠে যাচ্ছে। দেখতে দেখতেই আমার উপর অগনন মানুষের শরীর। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানিনা।

সম্বিত ফিরে পেয়ে দেখি উঠার শক্তি নেই। চোখে অন্ধকার দেখছি। আমার উপর ভারী বস্তু চেপে আছে। অনেক কষ্টে হাত দুটো মুক্ত করে সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলে তুললাম উপরের দেহ দুটি। ওমা! এ দেখি বুড়ী আর খুকু। বুকের ধুক পুকানি দেখে বুঝলাম বেঁচে আছে। জ্ঞান নেই। আস্তে আস্তে হাত ধরে ওদের টেনে তুললাম পানির উপর। ওদের জ্ঞান ফেরাবার সময় নেই। স্বাতী শুভ কোথায়? মিষ্টি বৃষ্টি মানিকদা? এগুনো যাচ্ছে না। সবাই শুয়ে আছে সবাই কি মৃত? হায় আল্লাহ এ তুমি কি করলে ! বুকের ভেতর থেকে হাহাকারের মত গভীর দীর্ঘশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এলো কথা কটি। একটু একটু নড়াচড়া। উঠে বসার চেষ্টা। আমার পেছন দিক থেকে কে যেন খামছে ধরলো ঘাড়ের মাংস। পেছনে ফিরে দেখি মানিক দা।

ওরা কোথায়?

হাত বাড়াতেই বুকের মধ্যে আঁচড়ে পরে ডুকরে কেঁদে উঠলো হা ভগবান ! জোর করে মানিকদাকে ছাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গেলাম। আমার ছেলেমেয়ে? কোথায় ওরা? চিৎকার বেরুচ্ছে না গলা দিয়ে। কে যেন সাড়াশী দিয়ে আমার গলা চেপে ধরেছে। ষ্টেজের দিকে এগুচ্ছি আমি। ওরা ওখানেই ছিল। বটবেদীর সাথেই লাগোয়া কাঠের মঞ্চ। আশ্বর্য! মঞ্চটা অক্ষত আছে! মঞ্চের নিচে অনেক মানুষ। ভয়ে কেউ বেরুচ্ছে না। হামাগুড়ি দিয়ে মঞ্চের নীচে গেলাম। অন্ধকার। তমসা ভ্যানিটির ভেতর শুধুই আর্তনাদ। স্বাতী ... শুভ .... ডাকছি - সাড়া নেই কারো। মানুষের ঠাসাঠাসিতে বেশীদূর এগুতে পারলাম না। বেরিয়ে এলাম। পাগলের মত মানুষ দৌড়াচ্ছে। জামা কাপড়ের ঠিক নেই। আহতদের আহাজারি। ছিন্ন ভিন্ন মাংস হাড়গোর। দলা পাকানো মাংসপিন্ড। মানবতার কলংক হয়ে বটের ডালে ঝুলে আছে। মানুষের রক্ত বিটপীর সবুজ পাতায় অশ্রু হয়ে ফুটে আছে। ধুলোয় ধুসর হয়ে গেছে সবুজ রমনা। নীচে রক্তবন্যা। উপরে ধুলোর ঝড়। আমি পাগলের মত চিৎকার করছি। স্বা-তী... শু-ভ... - মি..স..টি - বি..স..টি .....। মন বলছে ওরা মঞ্চের কাছেই আছে। ফিরে এলাম মঞ্চে। বুড়ী পাগলের মত চিৎকার করছে স্বা-তী-শু-ভ। ওর আঁচল ধুলায় লুটাচ্ছে। কে যেন পারা দিলে বুড়ী হুমড়ি খেয়ে পরলো রক্তধুলোর কাঁদায়। তুলবার শক্তি আমার নেই। খুকু মানিকদাকে ধরে আমাদের দিকে এগুচ্ছে। মানিকদার দৃষ্টি বিভ্রান্ত। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। শিথিল বাহু খুকুকে ধরে রাখতে পারছে না। আমার ভেতর বলছে “লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সোবহানাকা ইন্নি কুনতুম মিনাজ জোয়ালেমিন”, ‘বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা বিপদে আমি না যেন করি ভয়।” হাত বাড়িয়ে মানিকদাকে ধরলাম। আমার মিষ্টি বৃষ্টি কোথায়? খোকন ভাই কথা বলছিস না কেন? খুকুর ভাংগা গলা ফরিয়াদ জানায়।

এক হাতে মানিকদাকে অন্য হাতে খুকুকে বুড়ীকে পেঁচিয়ে ধরে প্রাগৌতিহাসিক স্থবির গুহা মানবের মত চারটি প্রাণী দাঁড়িয়ে রইলাম। গুহার ভেতর অন্তহীন তমসা। ঝড়ের ঝাপটায় বাতি নিভে গেছে। মানুষের চিৎকার। কোলাহল। নাম ধরে ডাকা ডাকি। আহতদের গোঙানি। নিহতদের নিথর লাশের উপর আচম্বিতে কারো পা। আত্কে উঠে লাফ দিয়ে অন্য কারো উপরে পড়া। আবার ভয়ার্ত চিৎকার। রোদনে আহাজারিতে কারবালার হাহাকার। দু’জোড়া মানব মানবী আমরা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে আছি। চার জোড়া চোখ খুঁজছে আপন রক্তসৃষ্ট মুখগুলি, বুকের পাঁজরে যা খোদিত। ওরা কি বুকের ভেতরেই থাকবে না সশরীরে “আব্বু” বলে ডাকবে।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট সকাল ৮টা ১৬ মিনিট ১৩ সেকেন্ড। হিরোসীমা নগরীতে আনবিক বোমা নিক্ষেপ করে মার্কিন যুদ্ধ বিমানের কো-পাইলট বলে উঠেছিল “হায় ইশ্বর এ আমরা কি করলাম।” আজকের এই সোনালী সকালের হর্ষ উৎফুল্ল আনন্দ মুখরিত বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে যে ঘাতকরা বোমা মেরে শত শত লোককে হতাহত করলো

তারা কি একটুও বিবেকের দংশন অনুভব করেনি? হয়তো ওরা এদেশের ভুমিসন্তান নয়। মাটির গন্ধ ওদের বুকে লাগেনি। লাগলে এ বিভৎস নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটাতে পারতো না।

আব্বু - আম্মু !
শুভর গলা না?
হ্যাঁ ! তাইতো !
মঞ্চের নীচ থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরুচ্ছে। আ-ব-বু ...। কাঁদতে কাঁদতে স্বাতী বেরিয়ে এলো। ওর পিছনে মিষ্টি বৃষ্টি।
খুকু
বুড়ি
মানিকদা।

দেখো দেখো। বেঁচে আছে। বেঁচে আছে ওরা। আমার চেঁচামেচি চিৎকারে হতবিহবল মানুষগুলি ফিরে তাকালো। মঞ্চের নীচ থেকে আরো অনেকেই বেরুচ্ছে। মঞ্চের আশপাশে একটা জটলা বেঁধে গেল। আমরা ধীরে ধীরে জটলা থেকে বেরিয়ে এলাম। সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে এগুনো যাচ্ছে না। শুধু কান্না। পুলিশও আসছে না। একটা এ্যম্বুলেন্সেরও দেখা নেই। এক মহিলাকে দেখলাম পাগলের মত ছুটছে মেয়ের নাম ধরে ডেকে ডেকে। এ মহিলা মঞ্চের কাছেই ছিলেন। আমি যখন ফটো তুলি তখন আমাকে জায়গা দিয়েছিলেন। কিছু বলার আগেই ভীড়ে হারিয়ে গেলেন। আহতদের আর্তনাদ স্বজন হারাদের বেদনা, সব হারানোর হাহাকার উর্ধ্বমুখী আকাশের দিকে ধাবমান দীর্ঘশ্বাস কি আল্লাহর আরশ কাঁপিয়ে দিচ্ছে না? আপনা থেকেই আমার মুখ থেকে বিড়বিড় করে বেরুচ্ছে .. "আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধুলীতে অভিশাপ দিচ্ছি - আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ -- দিয়েছিলো সেটে / মগজের কোষে কোষে যারা পুতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ / দগ্ধ রক্তাপ্লুত। বুড়ীর কণ্ঠ .. "যারা গনহত্যা / করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেতে ও খামারে / আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক / পশু সেইসব পশুদের / খুকু কম্পিত গলা মেলালো ... ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের / সারিবদ্ধ দাঁড় করিয়ে নিমিষে ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি ঝরালেই সব চুকে বুকে যাবে তা আমি মানি না / মিষ্টির করুণ কণ্ঠ বেজে উঠলো .. হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে মাঠে / ক্যাম্পাসে বাজারে / স্বাতীর বেদনার্ত গলা .. বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়েছে / ছড়িয়ে / আমি তো তাদের জন্য অমন সহজ মৃত্যু কামনা করিনা। শুভর ক্রুদ্ধ গলা ... আমাকে করেছে বাধ্য যারা / আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত / সিঁড়ি ভেঙ্গে যেতে / বৃষ্টির ঘৃণা মিশ্রিত কণ্ঠ ... ভাসতে নদীতে আর বন বাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে। মানিকদা উম্মাদের মত চিৎকার দিয়ে বল্লেন - অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেইখানে দজ্জালদের। "ভয়ার্ত জনতার পলায়নপর মিছিল থমকে দাঁড়ালো। আচমকা ঘুরে দাঁড়ালো। এগিয়ে আসছে জনতা।" আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধুলীতে / অভিশাপ দিচ্ছি। কণ্ঠ থেকে কণ্ঠে, সামনে থেকে পিছনে ডাইনে থেকে বাঁয়ে ধ্বনিত হতে লাগলো - অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেইখানে দজ্জালদের। বোবা মানুষগুলি যেন আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে ... বেশামাল বেহুস মানুষগুলি যেন আবার হুঁশ ফিরে পেয়েছে, ভয়ার্ত রিক্ত নিঃশ্ব মানুষগুলি যেন বেঁচে থাকার মন্ত্র ফিরে পেয়েছে।

সবার কণ্ঠে সেই মৃতসঞ্জিবনী মন্ত্র ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ... "আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধুলীতে অভিশাপ দিচ্ছি। কি যেন যাদু আছে এ কবিতায়। কি যেন অমোঘ শক্তি লুকিয়ে আছে এ কথায়। সাহসহারা ভীতু মানুষগুলি সাহসী হয়ে উঠছে। তাদের শিথিল পেশীগুলি শক্ত হয়ে ফুলে উঠছে। তাদের অচল পাগুলি সচল হচ্ছে। কণ্ঠে ফিরে এসেছে গান। মিছিলের গান। গণসংগীতের জলদগম্ভীর কোরাস সুর। কণ্ঠে ভাসছে। আকাশে মন্ত্রিত হচ্ছে। বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে। ইথারে ইথারে দিগদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ছে অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খানে দজ্জালদের ...।" প্রতিবাদে প্রতিরোধে বাঙালী বরণ করছে রক্ত নদীতে ভেসে ভেসে। রক্ত পলাশ অর্ঘ্য দিয়ে রক্তিম নববর্ষকে।
(কৃতজ্ঞতা : কবি শামসুর রাহমান)

সুমনা মাহমুদ

....

মাহাম–কে

তুমি সুন্দর। তুমি চমকপ্রদ
তবে ক্যানো দেখিনি তা শুরু থেকেই?

সুযোগ তো নিয়েছি বহুবার
সময় যা কিছু দিয়েছে আমায়।

তুমি তো এখন দূরে - বহুদূরে
জানি না কি করবো এখন,
সময়টা বড়ো ফাঁকা, দিন কাটে একা একা।

সতত তোমায় দেখি, পলকহীন চেয়ে থাকি
রাতদিন ভাবি শুধু আবীত দিনগুলি,
ক্যানো আরও ভালো করে বাসিনি ভালো?

সবই তো নিয়েছি তোমার
ভেঙ্গেছি হৃদয়ের সব দ্বার, বহুবার।
তবে ক্যানো বুঝতে পারিনি!
ভালো তো বেসেছি সেই শুরু থেকেই।

মাহমুদুল হক সৈয়দ

....

ব্যর্থ সময়

রাতের আগমনে বন্য পশুর মতো
ঘুর ঘুর করে উষ্ণ বাতাস জঠর পীড়নে।

ঊষর মরুতে তুষার আলোতে
একফালি স্বপ্ন ঘুমায় মলিন দারিদ্রতায়।

উভয়সংকটে মস্তিষ্ক য্যানো সক্রেটিসের
পাথুরে বালিশ। চোখ দুটো নিথর পুকুর।

সময় হেঁটে চলে শতাব্দির কাঁধে চড়ে
সরিসৃপ পড়ে রয় বালুকার আঙ্গিনায়।

মাহমুদুল হক সৈয়দ

....

কে বাড়াবে হাত

বাস্তবতা, গতি ও অস্বাভাবিক স্বপ্নপ্রয়াণ
স্বদেশ এখন অতিউৎসাহে
নষ্ট চাঁদের কোলে লাফিয়ে বেড়ায়।

মলিন ধুলো ঢেকে দ্যায় সব তন্ত্র-মন্ত্র
চেয়ার, টেবিল, হাতের কলম। শাড়ি, গহনা
আর ফর্সা রমণীর কাকজোৎস্নামুখ।
টুপি দাঁড়ি শেরোয়ানি হেসে ওঠে উল্লাসে
উড়ায় চাঁদোয়া ঈষৎ রঙিন আঁচলে।
কে বাড়াবে হাত মুছে দিতে এসব - কে
আঁকবে চিহ্ন ওই ময়লা ধুলোয়? নাকি
আউলা ধুলোই দিনে দিনে ঢেকে দিবে সব
অর্জিত গৌরব, দর্পিত সৌন্দর্য্য; দীপ্র বর্ণমালা
একাত্তরের শপথের সঙ্গীন
আর মুক্তিযোদ্ধার রক্তভেজা শার্ট?

মুনীর আহ্‌মেদ

....

এবার তুমি ওঠো

চেয়ে দ্যাখো ঐ চাঁদ ডুবে যায়।
জোয়ার ফেরা নদী
ভাঙ্গে একূল ওকূল। ওপারে নামে আঁধার।
এখনো আক্রুর মাঝি
তিন ঠেঙা হাওয়াই পাল
খুঁজে ফেরে উজান বাঁকের তীর।

জলকন্যা খোলাজল স্থির
জাল ফেলে বুড়ো মকিম গাজী
মুক্তিযোদ্ধা সেই বীর শাহেদালী
ক্র্যাচ ঠেলে ঠেলে ঘরে ফেরে।
বড় আশ্চর্য শাহেদালীদের বাংলাদেশ!
জীবন আর জীবনসর্বস্ব সব কিছু তার।
জীবনের একূল, ওকূল সর্বস্ব খুইয়ে নিয়েছে তার
সময়ের শেষ প্রান্ত এখন
এই বুঝি নেমে আসে বিহ্বল আঁধার।

সফিক আলম মেহেদী

....

ছিন্নমেঘ

কোথাও আমার জন্যে একফোটা বৃষ্টি
নেই; আকাশে উড়ছে একা ছিন্নমেঘ
বিরহবর্ণ সময়ের। পার্থ নই
সর্বভুক নিয়তির কাছে পরাবৃত্ত
পথিকের মতো করুণ আঁচল পাতি
রাত থেকে ভোর যেন দূরের অশেষ
পথ; প্রেম স্বপ্ন স্মৃতি কিছুই থাকে না

স্থির, মায়াবী ঘাতক জীবন বদলে
দেয় অলক্ষ্যে সবার, ইমন কল্যাণ
নয়, ভোরের আলোয় ঝরে সান্ধ্যরাগ।

ফিরোজ খান

....

নীল সমুদ্রে ঘর

এইবার চক্ষুমেলে দ্যাখো সওদাগর
তোমার প্রাণের সাম্পান ভাসবে
নীল সাগরের জলে
যাত্রার আয়োজনে তুমি এতো নিস্প্রভ কেন?)
চেয়ে দ্যাখো,
ঐ ভেসে যায় সারি সারি নাও
আলোর মালা গেঁথে চলে
দলবদ্ধ যাযাবর জাহাজ
গহীন সমুদ্র পথে কোথা যায় ভেসে!

নোঙর তোলা হলো গানের সুরে
মাস্তুলের দড়িতে পড়ে টান
রুদ্র হাওয়ায় দ্যাখো পালের কাঁপন
ক্ষুব্ধ জলের ঢেউ
ভাঙে ছলাৎছল
আকাশ কাঁপিয়ে ডাকে
মেঘ গুড়ু-গুড়ু
লোভের প্রসার নিয়ে যাত্রা হলো শুরু।

কি পণ্যে ভরেছো এই সাম্পানের খোল
কিছু কি রইল পিছে
কুলের সীমানা ঘিরে
তারদিকে মন কেন যায় ফিরে ফিরে?
সম্মুখে চক্ষুমেলে দ্যাখো সওদাগর
গহীন সমুদ্র মাঝে বাণিজ্য বন্দর।

দেওয়ান আব্দুল বাসেত

....

ঝড়ো মাতা বৈশাখ

নতুনের কথা কয়, ঝড়ো-মাতা বৈশাখ
আম্র মুকুলে ভরা, ফল, পাতা, ওই শাখ।
বৈশাখী নাচে তাতে ছিঁড়ে পাতা, ফুল;
দানবী কী বৈশাখী? না-না ওটা ভুল !

ঝড়ো হাওয়া এলে শত ভেঙ্গে যায় ঘর,
ভেঙ্গে পড়ে গাছ-পালা, ভাঙ্গে নদী-চর !

তবে কী গো বৈশাখী আমাদের ও পর ?

না না। সেতো ভুল গুলো ঝেড়ে করে ছাপ,
ধুয়ে-মুছে দেয় যতো ছিলো পাপ ও তাপ !
বৈশাখী ভাঙ্গে শুধু নতুনের জন্য
সক্কালে সুজনেষু, বৈকালে বন্য !
ভাঙ্গাটাকে যেন মোরা গড়তে পারি,
সেই কথা বৈশাখী বলে প্রতিবারই !

দেওয়ান আব্দুল বাসেত

....

আমরা সবে প্রতিবাদী

বোম ফাটালো কারা?
ছায়ানটের বর্ষবরণ
বটের মূলে যাঁদের মরণ
কিন্তু ওরা কারা?

আমরা জানি কারা
কর্তা নাকি কর্ম-করণ
দেখতে কেমন পোশাক-গড়ন
বাঙলা এবং বাঙালিদের
ঘৃণা করে যারা।

বর্ষ শুরু মাস
রক্তে আমর দ্রোহের আগুন
ধরতে ওদের সবাই জাগুন
আমরা সবে প্রতিবাদী
চাইবো তাদের লাশ।
ওরে আমার পাগলা বাউল
কালবোশেখী ঝড়,
সপ্ত-আকাশ নিয়ে তাদের
উপর ভেঙ্গে পড়।

শেখ আবুল বাশার

....

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা
ছোট্ট একটি শব্দ
একটি অভিব্যক্তি, একটি জাতির মুক্তি
বাঙলা, বাঙালির নিপীড়িত জনতার।

স্বাধীনতা
এক অব্যক্ত আনন্দ

ছোট্ট শিশুর আলতো কচি ঠোঁটে
যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপকলি।

স্বাধীনতা
এক দুর্বার গতি
কল্লোল ভরা মধুমতির বুকে
পালতোলা ধাবমান তরী
সরিষা ফুলে এলোমেলো বায়
পাহাড়ী ঝর্ণা যেন দূর্বার দূর্জয়।

স্বাধীনতা
ভাব, ভাষা, অভিব্যক্তি প্রকাশের
শ্বাশ্বত এ বাঙলাকে ভালোবাসার
সূর্য সন্তানকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা জানাবার
সে আমার জন্মগত আজন্ম অধিকার।

অধ্যাপক হেলালউদ্দীন আহমদ এর চতুষ্পদী কবিতা

....

চুম্বন

কবিতার রক্ত শোষণ করে
মশাটা যদি আমাকে কামড়ায়,
হাতলে বেশ মজাই হবে
এমন কামড়ে দুঃখ নাই।

চিড়িয়াখানা

এ পৃথিবী একটা চিড়িয়াখানা
নানান কিসিমের জন্তু আছে,
সবচে' হিংস্র জন্তু মানুষ
অন্য সবই তার পিছে।

চমৎকার

একতলা একটা সুন্দর বাড়ি
ব্যাংকে পঁচিশ লাখ টাকা,
গ্যারেজ একটা সুন্দর 'কার'
চমৎকার ঘুরবে জীবন চাকা।

চিরন্তন

সঙ্গম আর সন্তান উৎপাদন
এটা কোন কীর্তি নয়,
মানব কল্যানের সাধনা করো
কালের বুকে স্মৃতি অক্ষয়।

চাহিদা

আল্লাহর জিকির করার আগে
থালা ভরা ভাত চাই,
পেটের ভেতর আগুন জ্বললে
জিকিরে মোটেই মজা নাই।

হুমায়ুন কবীর

....

অবহেলিত

ঠিকানা বিহীন একটি চিঠি
পড়ে আছে রাস্তার পাশে
জমে আছে তার উপর আবর্জনার স্তুপ
জলে ভিজে রোদে পুড়ে
বিবর্ণ হয়ে গেছে তার গায়ের রং
পড়ে আছে বহুদিন
অযত্ন আর অবহেলায়
করুণ চোখে তাকিয়ে আছে
কেউ যদি পৌঁছে দিতো
কোন ঠিকানায়।
কিন্তু কোথায় সে ঠিকানা
নিজেও সে জানে না
ভুলে গেছে তার জন্ম পরিচয়
পথিকেরা পায়ে পায়ে পিষে যায়
ইতর প্রাণীগুলোও তাকে মাড়িয়ে যায়
হাত দিয়ে তাড়াবার শক্তি নেই
নেই তার প্রতিবাদ করারও সাহস !!

কাঞ্চন মল্লিক

....

তোমাদের কাছাকাছি

আমি অনেক দূরে নই
কাছেই,
আমারই কবিতায়।
আমি বৈচিত্রময়
প্রগতির স্রোতধারা
আনন্দে বিশ্বাসী
কাঁন্নায় বিশ্বাসী নই
তবুও কাঁদতে হয়,
কাঁদি অনিয়মের দৌরাত্ম্যে।
প্রকৃতি সুন্দর; মনোরম।
নিষ্ঠুর দুপুরের মতো

তখনো কাঁদি, গালি দিই
অসভ্যতা এখনো লেগে আছে
দেশে-বেশে, সমাজ গোত্রে
আমি ঘৃণা করি তারে।
সখ্যতা আমার সৃজনে,
প্রেমে, ভালোবাসায়,
অবাধ মেলা-মেশায়,
এখানেই আমি
এখানেই বসবাস আলিঙ্গনে।
কাছেই। শীত বর্ষা রৌদ্র ঝড়ে
কুয়াশার স্নিগ্ধতায়
রোদের প্রচন্ডতায়,
আমারই কবিতায়।

বাতেন রহমান

..

সন্ত্রাস

আজকাল প্রতিবেলা, এইদেশে, মানুষ
হাতের মুঠোয় মৃত্যু নিয়ে হাটে-
যখন ঘর হতে বেরোয় কোন কাজে
একাকী অথবা প্রিয়জন সাথে
দূরে কোথাও বেড়াতে - রেস্তোরায়
কলেজে
অফিস - আদালত
মিছিল - মিটিং - হরতাল
এবং বাস - লঞ্চ - সর্বত্রই মৃত্যু থাকে ওঁৎ পেতে !

ভালোবাসায় কমল এবং জটিল মৃত্যু থাকে প্রখর
ভালোবাসা এবং ভালোবাসায় দিনযাপন এক নয়
ভালোবাসা স্বপ্নময় উদার নীলাকাশ;
যাপন এক প্রকার দায়ভার
যেখানে সুখ বিপন্ন নৈশপ্রহরী
জলমগ্ন অগনন আবাসের দোদুল্যমান স্বপ্নকেল্লা।

শাদা মোড়কে ভালোবাসার ঘুপুরী অখন্ড স্মৃতির যাজক
নিরালা দুপুর ঝাল-টক-মিঠা আজন্ম নিরন্ন
সূর্যের মোহে রাতের নিমকান্না তুলে আনে ‘কাঁচাগোল্লা’
আলোক প্রভাত,
চন্দ্রের রূপোলী জ্যোৎস্না পৃথিবীর নির্মল কাগজে রেখে যায়
চঞ্চল মানুষের কিছু সরব পদচিহ্ন ... অস্থায়ী,
কিন্তু মানবের পদছাপ চন্দ্রে চিরকালীন উল্লসিত।

প্রতিটি ভালোবাসার মুখে জল এবং মাটির কথা,

রোদ বৃষ্টির কথা, কোমল ঘ্রাণে কবিতার পটভূমি...
ভালোবাসার কথায় সবাই রয় বুদ
আবার বেগবান প্রমত্ত ...
কেউ কেউ চোখ বুজে আবেশে, স্বপ্ন দেখে, আকাশে উড়ে;
কিন্তু এত কিছুর স্বপ্নময় মোহন সুখে ও মৃত্যু থাকে বুকের তলে।

দেওয়ান আব্দুল বাসেত

....

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই বালকের জন্ম ছিলো
জমিদার ঘরে,
সকাল বিকেল করতো খেলা
জ্যান্ত ঘোড়ায় চড়ে।

কি জানি কোন খেয়ালে
'জল পড়ে পাতা নড়ে'
লিখলো সেদিন দেয়ালে—

ওই লেখা তাঁর হাতে খড়ি
হাত পাকাতে শুরু,
অবশেষে হলেন তিনি
সব কবিদের গুরু!

ঘুম ভাঙ্গালো বিশ্বে সবার
কবির গানের কলি,
নোবেল পুরস্কারও পেলেন তিনি
লিখে গীতান্জলী।

তোমার আমার সবার জানা
চেনা সবার কাছে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি
সবার মাঝে আছে।

রুমী সাঈদ

....

তাঁর প্রস্থান

সেই চেনাজানা পথ
হাই আর ছাই রং-য়ের গাড়িটা।
থেকে যাবে এ কোলাহলময় শহরে।
কবিদের আড্ডা চলবে রাতভর
অথবা সংগীতের অ'মিয় মূর্চ্ছনায়
কেটে যাবে নিস্তব্ধ রাতের প্রহরগুলো।

আলাপনে মেতে উঠবে কতগুলো
বিনম্র মুখ আর কথামালায় সাজানো
লেখকদের আবাসনগুলো

বর্ণমালা দিয়ে থরে থরে সাজানো
বর্ণীল প্রকাশনাগুলোও
প্রকাশিত হবে সয়ম্ভরা শব্দ সম্ভারে।

ঘন্টা, মিনিট, সেকেন্ড
কেটে যাবে অহর্নিশি
সময়ের হাত ধরে চিরায়ত নিয়মে।

একজন কবির নিরব প্রস্থানে
থেকে যাবে একটি বিনম্র মুখ।
কিছু কথা কিছু আলাপন।
আর একরাশ মধুময় স্মৃতি নিয়ে
একজন কবির অম্লান অবয়ব
থেকে যাবে আমাদের হৃদয়ে-হৃদয়ে।

মীর রুমী আহমেদ

....

নেই

ভর দুপুরে ঝিমিয়ে পড়ি
ক্লান্তিময় অবসাদে
বুকে প্রেম নেই
চোখে স্বপ্ন নেই
নিরাশায় এপাশ ওপাশ করি।

পড়ন্ত বেলায় পথ ধরি
আবছা অভিপ্রায়ে
প্রগতির ধারা নেই
সুমতির সাড়া নেই
এক ছন্দহীন যুদ্ধে লড়ি।

আঁধারে হাতড়ে নেই খড়ি
আলোর সন্ধানে
লাইটারে গ্যাস নেই
পকেটে ক্যাশ নেই
প্রভাতের অপেক্ষায় মরি।

ব্যাঙ্গ অনুকাব্য

....

তানভীর আলাদিন

[১] বাবা-মায়ের কোনো চিঠির
দেয়না কোনো এ্যান্ছার
এই প্রবাসে এখন খোকার
থাই লটারী ক্যান্সার।

[২] ও নানু, দেখো না
মা কতো মিথ্যুক
চাঁদ কারো মামা হয়?
কেনো কাশো - খুক - খুক !!

[৩] লাইলীর প্রেমে মজনু এলো
জুলিয়েটের তরে রোমিও
আমার বুকে দুঃখের সাগর
ডুবতে এলে তুমিও?
তোমার সাথে প্রেম করতে
নেইতো আমার মানা
ব্যাংক ব্যালেন্সটা কেমন তোমার
থাকলে শুধু জানা।

শাহ্জাহান চঞ্চল

....

অসাড় তত্ত্ব

আকাশ পালক কিংবা সমুদ্র উদরে
দৃষ্টি পৌঁছে না বলে
চোখে ভাসে নীল,
বলেছিল উদাস বাউল
তত্ত্বটা এরকমই ...
নীল নীল কষ্ট হৃদয়ে তোমার
যখন বল তুমি
সহজেই বুঝি,
হৃদয় আকাশের চেয়ে দূর
গভীর সমুদ্রের চেয়েও ...
এতদসংক্রান্ত তত্ত্ব সবইতো অসাড়
আমার চোখে তুমি
চির অরণ্য সবুজ;
কেননা রাজহংসি তুমি সবুজ বলে
আমার দৃষ্টি হয়েছে প্রখর।

শাহ্‌জাহান চঞ্চল

....

একজন কবির প্রতিচিত্র

(জেদ্দা প্রবাসী কবি আব্দুর রাজ্জাক সুজনেষু)
লোহিত সাগরের নীল ছোঁয়া জল মেখে
জেদ্দার আকাশে যখন,
তরমুজ ফালি চাঁদ 'সুমনা'র ড্রয়িংরুমের মাথায়
বসিয়েছে হাঁট - পাংশুল জ্যোৎস্নার,
সেই একদিন তোমাকে দেখা ...

তোমার কণ্ঠস্বর দৌড়ে যাচ্ছিল সপ্তর্ষিমন্ডলে
হাবিব ভাই, মাহমুদ, ইলামজিদ এবং
সফিউল্লাহ ভাইয়েরা কণ্ঠকে বেঁধে রেখে স্বরগামে;
তোমার চোখ পুরুলেন্সের অন্তরালে ছড়াচ্ছিল
শালডিঙ্গি সবুজের জন্য
          মৌরঙ ভালবাসা ...

দ্রোহ এবং প্রেমের নামান্তর
          তোমার অন্তর
কবিতার ঘাসফুলে ভরা;
কিছুটাক্ষণ দেখাতেই
তোমায় চিনে নিয়েছি কবি,
শচীনন্দন তুমি;
সপ্নের ফেরিওয়ালা,
কবিতাপটে লিখেছ ইতিহাস
শিকড় সন্ধানের বিভাস,
অঙ্গীকার পূর্বসূরীর ঋণ স্বীকারের ...

শ্রাবণ স্মৃতি
শাহ্‌জাহান চঞ্চল
শ্রাবণ বরিষণ
প্রিতম প্রিজম আমার
কলাপাতা রঙ শৈশবের;
আমন ধানের গন্ধ ঝুঁকে
বহুকাল আগে
বৃষ্টির পায় প্রণতি রেখেছিল
          মেঘের সাতকন্যা ...
উঠানের পিঁড়িতে বসে কন্যাসকল
আদুল আমাকে
          ইশারায় নিয়েছিল ডেকে।
মাটি ছিল আমার কাছে
          সাতকন্যার জল
মাটিজল - জলমাটি

এই নিয়ে ছিলো খেলাঘর।

বটের ডালে শঙ্খচিল
হলুদ চোখে ছড়িয়েছে
যাযাবর ব্যথা;
বিনোদিনী বাই শুনিয়েছে
কলমি হেলেঞ্চার সাথে
সাতকন্যার অভিসার কথা।
টিনের চালে তা-তা থৈ থৈ
সাতকন্যা নেচেছিল
কাক শরীর রাতে;
মায়ের কাছে কিসসা শুনে
হারিয়ে গেছি আমি তখন
বানেছা পরীর দেশে।

আলিমা জুলফিয়া নার্গিস

....

ফিরে যাই

কোথাও না, কোথাও তো যেতে হবে,
তাই, তার কাছেই ফিরে যাই।
তার মেঘলা চেহারার কাছে,
দয়সারা হাসির কাছে।
বার্ধক্য ভাবনার কাছে।
উত্তাপহীন ভালবাসার কাছে।
বশ্যতা স্বীকার করি।
পৃথিবী, প্রকৃতি, স্বাধীনতা, ও স্মৃতিরা আমাকে ডাকে।
সবাইকে ফিরিয়ে দিয়ে
তার কাছেই ফিরে যাই।
অদৃশ্য বাঁধনে হাত, পা বাঁধা!
সব কিছুতেই জোড়াতালি
জীবনটাও জোড়াতালির।
তবুও তার কাছেই ফিরে যাই।
কোথাও না কোথাও তো যেতে হবে।

রেবেকা ইয়াসমিন

....

তুমি

ঘর আর ঘর সংসার নিয়ে আমার জীবন যাপন
ঘরের সুখ আর শান্তি নিয়ে
আমার সময় কাটে
জীবন তো এত ছোটো কিছু নয়
কেনা বেচা করা যায়
হাটে আর ঘাটে।

তোমাকে ঘিরে আমার যত সব স্বপ্নবুনন—
তোমাকে ঘিরে আমার সারাটা জীবন।
তুমি কি জানো —
তুমি কি জানো —
কি যে কষ্ট তোমাকে ছেড়ে
কষ্ট বৃক্ষ যেন দিন দিন উঠিতেছে বেড়ে।

আবুল বাশার বুলবুল

....

কবি বরেণ্য

কবি বরেণ্য
কবি মান্য
কবি গণ্য
কবি ধন্য।
কাব্য উপমা
কাব্য সুষমা
কাব্য মহিমা
কাব্য অনন্য।
কবির ঋণ, দান
সুর তান ও গান
রূপ-রস-ঘ্রাণ
সংস্কৃতির প্রাণ।
এক বিদায়ী কবির তরে
শুভেচ্ছা, হৃদয় ভরে।

হাবিবুর রহমান

....

ভালবাসার নদী

তোমরা যারা লড়ছ দেশ হতে দেশে
কাশ্মীর হতে ফিলিস্তিনে গুজরাট ফিলিপিন্সে
তোমরা যারা লড়ছো বর্ণেবর্ণে গোত্রে গোত্রে
জাতিতে জাতিতে ধর্মে অধর্মে।

তোমাদের জন্য সুসমাচার নিয়ে এসেছি আমি।
না শান্তির ললিতবাণী তোমাদের শুনাতে চাই না।
মরণাস্ত্র চালানোর গোপন গতিপথ ও রুদ্ধ করতে চাই না
জাতি সংঘের শীতল রক্তধমনীতে আমি উষ্ণ প্রবাহও চাই না।

আমি তোমাদের জন্য একটি পবিত্র নদী নিয়ে এসেছি।
হ্যাঁ - আমার হাতের মুঠোয় একটি ভালবাসার নদী আছে।
তোমাদের হারিয়ে যাওয়া বিবেককে খুঁজে নিয়ে এসো
এসো অবগাহন করো। তোমাদের হৃদপিন্ডকে বাইরে

নিয়ে এসো। এনে ধৌত কর।

পবিত্র জলের স্পর্শে তোমাদের পাপী আত্মা মুক্ত হবে
তোমাদের অসুস্থ হৃদপিন্ড সুস্থ হবে।
তোমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোষে ভালবাসা বাসা বাঁধবে
এসো অবগাহন করো। এসো ধৌত কর।
পবিত্র নদীতে তোমরা পুতপবিত্র হও
ভালবাসার যোগ্য হও।

এসো অনুরাগের সংলাপে পরস্পর সম্পৃক্ত হই
সিনাই থেকে গোলাপের জয়তুন বনে
মানুষ ও বৃক্ষরাজি যুথবদ্ধ আলীঙ্গণে
আশ্রয় নিক শাতিল আরবের ছায়া শীতলে।
ঝিলম ও ডাল লেকের অথৈ জলে হরপ্পা ও
মহেন জোদারের গলিতে গলিতে
এসো আমরা কেলিমত্ত হই জীবনানন্দে।

জাকির হোসেন

....

একজন দেশপ্রেমিকের অপেক্ষায়

দীর্ঘ অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকি
খরা অঞ্চলের কৃষক যেমন বৃষ্টির জন্য
সমুদ্রে ডুবে যাওয়া জাহাজের যাত্রী যেমন মৃত্যুর জন্য।
একজন ফিলিস্তিন যেভাবে অপেক্ষা করে
একটুকরা স্বাধীন আবাস ভূমির জন্য
ধরে নিতে পার আমিও তেমনি অপেক্ষায় থাকি।

কন্যা দায়গ্রস্থ দরিদ্র পিতা যেভাবে সৎপাত্রের
অপেক্ষায় উম্মুখ বসে থাকে
বস্তির সাবালিকা ফূলমতি যেভাবে অপেক্ষা করে
একজন সাহসী প্রেমিকের জন্য।

সন্তান জন্মদানের জন্য যেমন অপেক্ষা করে
বেদনার বন্ধ্যা নারী
তেমনি আমিও অপেক্ষায় থাকি একজন
দেশপ্রেমিকের জন্য।

জাকির হোসেন

....

নিরুত্তাপ উপকণ্ঠ

তোমার উপকণ্ঠে পৌঁছুতে অনেক পথ অতিক্রম করেছি
অতিবাহিত করেছি দীর্ঘ সময়

অপেক্ষা করেছি কাঙ্খিত বসন্ত উৎসবের।
সাইবেরিয়া থেকে আরো উত্তরের কোন
বরফ শীতল মরু অঞ্চল পেরিয়ে
তোমার কাছে এলাম
অথচ আয়োজন নেই
নগরীর প্রবেশপথে নেই সাজানো তোরণ
নেই বারতালী, স্বতস্ফূর্ত সঙ্গীত
আবহমান উৎসবের কোন চিহ্ন।
ভিষণ অনাশ্রয়ে কেটে যায় আরো একটি
নিরুত্তাপ রাত্রি।

আবুল কাশেম

....

নির্জনে হাঁটা

তবুও পথে হেঁটে হেঁটে কতোদিন একা
দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা পেরিয়ে নামে রাত
বিচিত্র খেয়াল গুলো হাঁটে পাশাপাশি
সংকীর্ণ ফুটপাত; ভীড়বাট্টা পেরিয়ে অলিগলি।

দরদালান, বাগান, রিকসা গ্যারেজ, বেমানান
আবাসিক লেনে, কোন একটি বাড়ির
ইটের রঙিণ প্রাচীর; সারাদিন বন্ধ থাকে
কফি কালারের গেট
আজও কানের ভেতর বাজে খিলখিল তরুণীর হাসি।

কোনদিন দেখিনি তাকে। কেবল কানপেতে
হেঁটে গেছি নির্জনে, দেয়াল ঘেঁষে ছুঁয়ে গেটখানি।
কতবার মনে হয়েছে এইবুঝি ধরা পরে গেছি
এইবুঝি কেউ বুঝে গেছে মানে হাঁটাহাঁটির।

তবে কিছুতেই বিশ্বাস হ'ত না যদিনা সেদিন
আজও অবিকল সেরকম হাঁটে কেউ শ্বাশত নবীন।

আবুল কাশেম বুলবুল

....

কাঁদে জীবনানন্দ দাস

সেইসব হরিণীরা চলে আসে শহরের পথে,
ঢুকে পড়ে নান্দনিক বাগানে, চড়ে বসে রথে
ইহাদের বুক থেকে উজ্জ্বল মৃদু কম্পন টের পাই।

আমার পরণের একখন্ড বস্ত্র নিয়ে
আমার চিন্তার পাশথেকে চলে যায় ওরা;

আবার বিকেল হলে জানালার পাশে
বিক্ষিপ্ত ঘোরাফেরা করে হরিণীরা।
এদের পায়ের পাতার মর্মর শুনতে পাই।

রাতের শেষ প্রহরে ভেঙ্গে যায় জলসা
তন্দ্রাতুর ঘোরের ভেতর যে যার পথে
বাড়ি ফেরে সন্তর্পনে রমনী নির্মোহ
প্রবীণ গালিব জীবনানন্দ দাস একসাথে।

ভোরের কাগজে আসে ঝলসানো হরিণীর লাশ
দেখে বাংলার মুখ কাঁদে জীবনানন্দ দাস।

গুলশান চৌধুরী

....

অনন্ত মর্মগাঁথা

'শ্বেত-পূরীর মঞ্চে গিয়ে
ব্যালে নাচে কোন লাভ নেই
দানব তো দানবই।
মানবের বন্ধু তো নয়।'

শান্তির পথে চলা পা'দুটির
এ ছিল স্বগত-ভাষণ।
কারণ অস্বীকৃতির সাহস ছিলনা
মুখ নামের মুখপাত্রটির।

কিন্তু রেহাই নেই।
কানে ঢোকে গোখরার শীতল গর্জনঃ
'কোথা যাও নীলচাষে বিমুখ দোসর?'
প্রশ্নের সাথে সাথে জাল হয়ে নেমে এল
দাজ্জালের ভক্ত পারিষদ।
বিমুখ মুখের ভেতর গুঁজে দিল ফ্লপি
বেজে ওঠে এক চোখা দাজ্জালের
দীর্ঘ স্তুতি-গান।
সভয়ে দু'ভাগ হয় পৃথিবীর গর্বিত রূপ।
এক হাত বেহাত হয়ে অনর্গল দেয় কুর্ণিশ।

বেহাল হৃদয়ে কাঁদে বেহালার তার
কারণ সে দু'হাতের মাঝখানে
চেপে আছে বার্লিন-প্রাচীর
রক্তের আহ্বানে নড়ে ওঠে হাত।
দু'হাত দু'হাতে খোঁজে,
মর্মে মর্মে খোঁজে,
যুগে যুগে খোঁজে নিশিদিন।

মুনির আহমেদ

....

তুমি যাবার পরে

তুমি যাবার পর কিছুদিন
থেমে রবে সমুদ্র কোলাহল
গর্জন গল্পের আসর
লোহীত নূরীর সুরঃ
লু-হাওয়া সাইমুম খেজুর
বাগান বেদুঈনী যাত্রির রাত্রির নূপুর।

তুমি যাবার পর
সময় ও স্রোতের কাঁটাগুলো
স্থির
কেঁদে কেঁদে এ দু'চোখ
ধূসর মরু পাথর নিবিড়।
কিছুদিন এ শহর লোকালয়
মানুষের ভিড়
শূণ্য মনে হবে।
তারপর প্রকৃতির নিয়মে একদিন
শুরু হবে পালাবদল ...
নাসপাতি, বেদানা, আঙুর
লেবুর বনে।
ফসল সম্ভার
তুমি বেঁচে রবে
ঝর্ণা ফোয়ারা সরোবর
মরুদ্যান নূরীর শব্দে
চার পাশে এত মানুষের ভিড়ে।

আজমেরী ফারুক চুমকী

....

আবর এসো

সূর্যের তপ্তরাঙা বল্লমাটি
হৃদয়ের ভেতরের নক্ষত্রে কাঁপন তুলেছে
চোখের ভেতরের চোখ দুটি খুলে দেখো
কে যেন বেদনার লণ্ঠন জ্বালিয়েছে।
ধীরে আরো ধীরে খুব ধীরে এসে
বসো।
বাতাস আজ গাইতেছে
জীবন সাগরের গান।

ভালবাসার প্রদীপ জ্বেলে আজ তা
নিজের হাতে নিভিয়ে দিলে

আঁখি জলে পারিব না রাখিতে বেঁধে।

ব্যাথায় ভরা সজল আঁখি
কেমন করে লুকিয়ে রাখি
নিরব থেকে বুলিয়ে দিলাম সকল কথা আজ।

আব্দুর রাজ্জাক

....

সেনাতন্ত্রের একজন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এমনই একজন লেখক যিনি পরিমাণে কম লিখেছেন এবং যাঁকে নিয়ে পত্র পত্রিকায়ও খুব কম লেখালেখি হয়েছে। একজন লেখক হিসেবে তাঁর লেখালেখির মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সৃজনশীল ও মুক্তিকামী লেখক। তিনি বিশ্বাস করতেন মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামী ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কারো পক্ষেই শেষ বিচারে সৃজনশীল ভূমিকা রাখা সম্ভব নয়। অপর দিকে আত্মপ্রচার যে সামাজিক দৈন্যের একটি বড় লক্ষণ তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এই গভীর সত্যটি প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। লেখক শিবিরের আন্দোলন ও সংগ্রামের সংগে যুক্ত ছেলেমেয়েদেরকে তিনি বিভিন্ন বিষয়ে লেখার জন্য অনুরোধ করতেন। দেশের তরুণ লেখকদেরকে নানা বিষয়ে লেখার সংগে সংগে বেশী করে বই পড়ার উৎসাহ দিতেন এবং দ্রুত বই প্রকাশকে খুবই অনুৎসাহিত করতেন।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জন্ম গাইবান্দা জেলার সাঘাটা থানার গোটিয়া গ্রামের মাতামহের বাড়ী। ডাক নাম মঞ্জু। চার ভাই। বোন নেই। ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী রাত ১১টায় তিনি জন্ম গ্রহন করেন। সে বছর খুব দূর্ভিক্ষ। ৪৩ এর মন্বন্তর। মা মরিয়ম ইলিয়াস। পিতা বি.এম. ইলিয়াস ওই বছরই বগুড়া সারিয়াকান্দী হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং বগুড়া মুসলীম লীগের সেক্রেটারী ছিলেন। ইলিয়াসের শৈশবের প্রথম কয়েক বছর কাটে বগুড়ার নারুলী গ্রামে। তাঁর পূর্ব পুরুষদের বাস সারিয়াকান্দী থানার চন্দন বাইশা ইউনিয়নে। ১৯৪৬ সালে পিতা বি.এম. ইলিয়াস নির্বাচনে বংগীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং দেশ বিভাগের পর প্রাদেশিক আইন পরিষদের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ছাত্র জীবনে তিনি কোলকাতা ইসলামী কলেজের অল ইন্ডিয়া মুসলিম ষ্টুডেন্ট ফেডারেশনের প্যানেলে ভিপি ছিলেন। বংগীয় প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের পর পরই তিনি সপরিবারে ঢাকা চলে আসেন। বাসা নেন পুরাতন সিমসন রোডে। ইলিয়াস ও তাঁর ভাই শহীদুজ্জামানকে ঢাকার লক্ষ্মী বাজারের সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার্স স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করানো হয়। পরে তারা জে এল জুবিলি স্কুলে ২য় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৯৫১ সনে তৃতীয় শ্রেণীতে না পড়েই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ৪র্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন। ১৯৫২ সনে স্কুল পরিবর্তন করে পৈত্রিক বাসভূমি বগুড়া চলে যান এবং জেলা স্কুলে ভর্ত্তি হন। এ সময় কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সত্যযুগ' ও 'আজাদ' পত্রিকায় তার গল্প কবিতা ছাপা হয়। দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় 'সওগাত' পত্রিকায় তাঁর গল্প ছাপা হয়।

১৯৫৮ সালে বগুড়া জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করার পর তিনি ঢাকা কলেজে আই, এ ক্লাশে ভর্ত্তি হন। থাকতেন কলেজের নর্থ হোষ্টেলে। এ সময় তিনি অবিরাম গল্প লেখেন আর পত্রিকায় পাঠান। অধিকাংশ গল্পই ফেরত আসে। দু'একটা ছাপা হয়। বন্ধু শহীদুর রহমান আর আব্দুল মান্নান সৈয়দের সংগে গল্পের নতুন ফর্ম নিয়ে আলোচনা চলে ঘন্টার পর ঘন্টা। ১৯৬০ সালে তিনি ঢাকা কলেজ থেকে আই,এ পাস করেন। সোসিওলজীতে ভর্ত্তি হওয়ার আগ্রহ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সোসিওলজী বিভাগে কোনো ছাত্র ভর্ত্তি করা হয়নি বলে তাঁর আর সোসিওলজী পড়া হয়নি। ভর্ত্তি হন বাংলা সাহিত্যে। এ সময় আড্ডা সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য বিষয়ক পড়াশোনা চলে সমান গতিতে। শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনে মুহম্মদ মোজাদ্দেদ, চিত্ত রঞ্জন হালদার, আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ইকবাল রুমী এবং আসাদ চৌধুরীর মত সহপাঠী ও বন্ধুদের সংগে চলে তুমুল আড্ডা। এর পাশাপাশি পাবলিক লাইব্রেরী আর বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে চলে সাহিত্য বিষয়ক পড়াশোনা। কবিতা পত্র "স্বাক্ষরের" সংগেও তিনি জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৬৪ সালে বাংলা সাহিত্যে তিনি এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৫ সালের

আগস্ট মাসে তিনি জগন্নাথ কলেজে প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন। এর আগে করটিয়া সাদত কলেজে দু'একদিন চাকরী করে চাকুরীটি ছেড়ে দেন তিনি।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭০ এর বছরগুলো আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের জীবনে "রেকস ডেজ" হিসেবে পরিচিত। জিন্নাহ এভেন্যুর রেষ্টুরেন্ট 'রেকস' এবং নবাবপুর হোটেল আরজুতে ছিল কবি সাহিত্যিকদের জমজমাট আড্ডা। বাংলা বাজারের 'বিউটি বোর্ডিং' এবং কাপ্তান বাজারের 'নাইল ভেলী' রেষ্টুরেন্টেও চলতো তুমুল আড্ডা। সাহিত্য, শিল্প, রাজনীতি, ইতিহাস, দর্শন, পুরাতত্ত্ব, সিনেমা, প্রেম, সংগীতসহ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হতো এই আড্ডাগুলোতে। এই সব আড্ডার সংগীদের মধ্যে খালেদ চৌধুরী, মুশাররফ রসুল, আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ, শহীদ কাদরী, নির্মলেন্দু গুণ, বিপ্লব দাস, রণজিত পাল, চৌধুরী জামান খান, মোহাম্মদ খসরু, ইয়াসিন আমিন, রফিক আজাদ, মাযহারুল ইসলাম ও মাহবুব আলম সহ অনেকেই। লেখালেখির পাশাপাশি এ সময় ইউরোপিয়ান সাহিত্যের উপর প্রচুর পড়াশোনা করেন তিনি।

১৯৬৪ সনে আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত "সাম্প্রতিক ধারার গল্প" গ্রন্থে তরুণ ইলিয়াসের গল্প অন্তর্ভূক্ত হয়। ১৯৬৯ সনে লিটল ম্যাগাজিন "আসন্ন"তে তাঁর 'চিলেকোঠায়' নামক গল্প প্রকাশিত হয়। ৬৮ এবং ৬৯ এর গণ আন্দোলন তিনি প্রত্যক্ষ করেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে। বিশেষতঃ পারিবারিকভাবে রাজনৈতিক পরিমন্ডলে বেড়ে ওঠা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সে সময়ের প্রতিটি মিটিং এ ছিলেন মনযোগী শ্রোতা। মাওলানা ভাসানীর কোনো মিটিংই তিনি বাদ দিতেন না। সে সময়ের সাহিত্য আড্ডায় প্রতিদিনের মত রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণই ছিল মুখ্য বিষয়।

চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব আর পরবর্তীতে নক্সালবাড়ী আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহ অনুসরণ করেছেন গভীর আগ্রহ নিয়ে। তখনকার দিনের প্রথম দিকে তিনি থাকতেন জোরপুর লেন এ। এরপর জগন্নাথ কলেজের ব্যাচেলর হোষ্টেলে ১০১ লুৎফর রহমান রোডে। এরপর কিছুদিন ছিলেন গেন্ডারিয়ার ১ অক্ষয় দাস লেন এ। সেখান থেকে ১/১ হেয়ার ষ্ট্রীট এ। ১৯৭১ এর মাঝামাঝি সময় থেকে জগন্নাথ কলেজের সহকর্মী কথা সাহিত্যিক শওকত আলীর ৪২/বি হাটখোলা রোডের বাসায় ভাড়া থাকতেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর পরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংগে শুরু হয় তাঁর গোপন যোগাযোগ আর তাঁদের আশ্রয় প্রদান। ১৯৭৩ সালের ১২ই এপ্রিল তিনি বিয়ে করেন সিরাজগঞ্জ মহিলা কলেজের ইতিহাসের প্রভাষিকা সুরাইয়া বেগমকে। বিয়ের পর তুতুল চাকুরী ছেড়ে ইলিয়াসের নিকট ঢাকায় চলে আসেন। ১৯৭৪ সনের দূর্ভিক্ষের সময় তাঁর পুত্র সন্তান আন্দালিবের জন্ম হয়। এ সময় তাঁর প্রচন্ড অর্থকষ্টে কাটে। এক দূর্ভিক্ষে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন আর এক দূর্ভিক্ষে তাঁর পুত্র সন্তান। বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রায়ই উইট হিউমর করতেন।

১৯৭৫ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'চিলেকোঠায়' নামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সাহিত্য পাতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গকে নৃশংসভাবে হত্যার পর সরকার সামরিক বেসামরিক ব্যানারে পরিবর্তন হয়। এ সময় 'সংবাদ' পত্রিকা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'চিলেকোঠায়' উপন্যাসটি ধারাবাহিক প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। তখন হাইলি প্রোপাকিস্তানী গভর্ণমেন্ট পাকিস্তানকে নিয়ে ঠাট্রা মস্করা সহ্য করবে না বিধায় পাকিস্তানকে নিয়ে ঠাট্রা মস্করা করা লেখা 'চিলেকোঠায়' প্রকাশে 'সংবাদ' অপারগত প্রকাশ করে। কারণ চিলেকোঠায় উপন্যাসে পাকিস্তানকে নিয়ে প্রচুর ঠাট্টা মস্করা ছিল। ইলিয়াস একটা চরিত্রে এ রকম সংলাপ আরোপ করে যেমন : "ইধংরপ উবসড়পৎধঃ রহমতুল্লাহ যে ডাঁট মারতে মাঝে মাঝে জিন্নাহ টুপি পড়ে" সংবাদ 'ইধংরপ উবসড়পৎধঃ,' জিন্নাহ, 'পাকিস্তান' এই শব্দগুলো বাদ দিয়ে ছাপে। তখনকার সরকার ক্ষেপে যেতে পারে ভয়ে 'সংবাদ' এই কাজটি করায় আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভীষণ ভাবে চৎড়ঃবংঃ করেন। সংবাদ তাঁদের সিদ্ধান্তে অটল থাকলেন - প্রোপাকিস্তানী গভঃকে তারা কিছুতেই ক্ষ্যাপাতে চাইলেন না। এক কিস্তি ছাপিয়ে তারা চিলেকোঠায় ছাপা বন্ধ করে দিল।

ইলিয়াস এ সম্পর্কে তাঁর নিজের প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন - ইতিহাসের পথ বেয়ে অনেক সত্য ভ্রান্তির কাঁধে ভর করে বসে। যেমন বাংলাদেশের মানুষকে যা বোঝানো হয় বাংলাদেশের সহজ সরল মানুষ তাই বোঝে। দুইশত তিরাশি দিনের মাথায় সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটা দেশ, যে দেশটি একটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে এবং পাকিস্তান নামক দেশটি যে দেশটি পরাজয়ের চরম গ্লানি সারা শরীরে মেখে ঘরে ফিরতে বাধ্য হয় সেই দেশটি

শেখ মুজিবের প্রতি এত ঘৃণা লালন করতেন যে তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সাফল্যের সুউচ্চ শিখরে উঠতে সমর্থ হয় আর তা সম্ভব হয় দেশীয় ষড়যন্ত্রকারীদের সহায়তায়। পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করার দায়ে ঘৃণা শুধু একজন মাত্র মানুষের প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকে না এমনকি তাঁর পরিবারবর্গের সদস্যদের হত্যার মধ্যেও নয়। তাঁর নিকটআত্মীয়দেরও কেউ বাদ যায় না এই অমানবিক হত্যাকান্ডের মধ্য থেকে। শেখ মুজিবের প্রতি পাকিস্তানীদের হত্যা ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ এভাবে ঘটলেও এখানেই তার ইতিরেখা টানা হয় না। ক্ষমতায় বসানো হয় পাকিস্তানপন্থী ক্রীড়নক সরকার। ২৮৩ দিনের মাথায় বাংলাদেশ বিরোধীরা পুরা মাত্রায় পূনর্বাসন হয়। সরকার গঠনের প্রক্রিয়ায় তারা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করে। ষড়যন্ত্রকারী মূল ব্যক্তিবর্গদেরকে রাষ্ট্রীয় দু'টি প্রধান পদ প্রদান করে পুরস্কৃত করা হয়। এই প্রোপাকিস্তানী সরকার খুব ধীরে সুস্থে এবং ঠান্ডা মাথায় বাংলাদেশ বিরোধীদের সরকারী পর্যায়ে ও সামাজিক পর্যায়ে পূনর্বাসনের কাজ সমাধা করে রাজনৈতিক পর্যায়েও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অব্যাহত রাখে। ষড়যন্ত্রকারীদেরকে কেউ যাতে রাজাকার বলতে না পারে সে ব্যবস্থাও পাকাপোক্ত করা হয়। পাকিস্তানীদের যাতে বাঙালীরা ভালবাসতে শেখে এর জন্য ব্রেনওয়াশের পদক্ষেপ হিসেবে মিডিয়া মাধ্যমগুলোর রশি খুব শক্ত হাতে টেনে ধরে রাখা হয়। পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীকে যারা সহযোগিতা করেছে সেই সব পাকিস্তানী চাটুকারেরা যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরিবর্তে পাকিস্তানীদের সাথে এক পাকিস্তানটিকে টিকিয়ে রাখার জন্য অস্ত্র হাতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল তারা খুব দম্ভের সাথে ক্ষমতায় ফিরে আসে - পরিস্থিতি এমন দাঁড়ালো যে তারা রাতারাতিই বাংলাদেশের হর্তাকর্তা সেজে বসলেন এবং এদেরকে তোয়াক্ত না করলে বাংলাদেশে বাসবাস করা কঠিন হবে। রাতারাতি তৈরী হওয়া এরকম একটি পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে দেশের আর সব বিবেকবান মানুষের মত ইলিয়াসেরও কিছুই করার থাকে না। পাকিস্তানীদের সম্পর্কে কিছু বললে বা লিখলে সরকার ক্ষেপে যাবে এটা জেনেও তিনি বলেন - "এই যদি পরিস্থিতি তা হলে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার প্রয়োজন কি ছিল? প্রোপাকিস্তানী সরকার ক্ষমতায় বসে আসলে দেশবাসীকে বুঝাচ্ছেটা কি? রাজাকার আলবদরদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার জন্য কি দেশ স্বাধীন হয়েছিল? ধোকা দেওয়ারও তো একটা সীমা আছে! আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ভীষণ ভাবে প্রোটেষ্ট করলেন এবং তাঁর লেখার কোনো কিছুরই পরিবর্তন করতে চাইলেন না। চরিত্রের মুখ দিয়ে যে অবধারিত সত্য বেরিয়ে গেছে সেই সত্যের পাশেই তিনি অনড় রইলেন। একটি শব্দও তিনি পরিবর্তন করতে রাজী হলেন না। "সংবাদ" এর পর এক কিস্তি ছাপিয়ে চিলেকোঠায় ছাপা বন্ধ করে দিল। ইলিয়াস আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না বলেই সরকারী কলেজের শিক্ষক হিসেবে বাকশালে যোগ দেওয়ার চাপ থাকলেও তিনি যোগদান করেননি। স্বাধীন দেশে বসবাস করে ভিনদেশী পরাজিত শত্রুকে একটু মস্করাও করা যাবে না। কি কারণে? তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কিছু লিখলে বা বললে, সরকারের মাথা ব্যথা শুরু হবে কেনো। সরকার কি আমাদের না পাকিস্তানীদের? এই ধরণের নানা প্রশ্নে তিনি নিজেকে ক্ষত বিক্ষত করেন। অবশেষে আবারও তিনি উচ্চারণ করেন : শেখ মুজিবকে হত্যা করে এরা আমাদের বাক-স্বাধীনতাও কেড়ে নিল। তিনি 'সংবাদকে' প্রোটেষ্ট করলেন - 'আপনারা এম্নি এম্নি ছাপা বন্ধ করে দিলেন? পাঠকরা আপনাদের এ কাজকে দায়িত্বহীনতা ভাবতে পারে। আপনারা যে ছাপতে পারছেন না সেটা লিখে দিন।" 'সংবাদ' অনেক কষ্টে তা লিখে দিয়েছিল। তবে তারা আভাসে ইংগিতে আখতারুজ্জামানকে বুঝিয়ে দিয়েছিল - আসলেই তাদের হাত পা মুখ মগজ ও কলম বেঁধে দেয়া হয়েছে।

'আমি ও আমার সময়' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন "কৈশোর পার হচ্ছি, সদস্য কলেজে ঢুকছি - ঐ যে সে সময় সেনা বাহিনীর থাবার নিচে পড়লাম। সারাটা যৌবন চলে গেলো সেই সাঁড়াশির ভেতর। আজও তার থেকে রেহাই মিললো না। মার্শাল ল'র জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে যে কিশোর পরিণত হলো যুবকে। যৌবনকাল পার করে দিয়ে আজ সে পক্ককেশ পৌঢ়। তার ক্ষোভ তার গ্লানি তা ব্যর্থতা তার অসহায়ত্ব তার অসন্তোষ এসবই কি তার সময়ের পরিচয়?"

পাথর চাপা জনগোষ্ঠী কেবল বাঁচার তাগিদেই মাথা বাঁকায়। ১৯৬২ সালে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠে। তখন আমরা ঘোরতর যুবক। একেকটা দিন যায় এই প্রতিরোধ ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। সামরিক শাসন মানুষকে এত বেশী অসহায় করে তোলে যে সামরিক শাসক আইউব খানকে হটানো ছাড়া মানুষের এই বিক্ষোভ আর কোন লক্ষ্য স্থির করতে পারে না। বন্দুকের জোর আর নির্বাচনের কল্যাণে গ্রামে গ্রামে তার ভৃত্যগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এরা নূতন এলিট। এদের নাম ব্যাসিক ডেমোক্র্যাট। ১৯৬৯ সালের বিদ্রোহকে ঠাঁই দিই কোথায়? এই প্রথম একটি আন্দোলন দেখেছি। যেখানে বিপুল গরিষ্ঠ মানুষ প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এমনভাবে এগিয়ে এসেছিল যা শুধু রাষ্ট্র নয় যাতে রাষ্ট্রের সামাজিক শাসন পদ্ধতিটিও আক্রান্ত হয়েছিল।

আমার সময় ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধ দিয়ে আঁকা। সাড়ে ৪ বছর বয়স থেকে "চাঁদ তারা শাদা আর সবুজ নিশান" বলে গলা হাঁকিয়ে মরেছি। সেই নিশানের ফাঁস দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মারা হলো লক্ষ লক্ষ মানুষকে। আর দেশ স্বাধীন হওয়ার সাড়ে তিন বছরের মাথায় অলিখিত নির্দেশে আমাদের স্বাধীনতার সনদ ধর্ষিত হয়। আমার বাক স্বাধীনতা রুদ্ধ করা হয়। উপন্যাসের ভাষা পরিবর্তন করার নির্দেশ দেয়া হয়। যে দেশটির বিরুদ্ধে এত বড় যুদ্ধ সংগঠিত হলো - এত হত্যা, এত মৃত্যু, এত ধর্ষণ, এত অত্যাচার মানুষ সহ্য করে দেশ স্বাধীন করলো সেই দেশের মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারবে না। তা হলে কি এই সরকার পাকিস্তানের সরকার। পাকিস্তানইকি তা হলে আমাদের দেশের সরকার গঠন করেছে। না হলে পাকিস্তানকে খুশী করার জন্য এ সরকার এত বেশী উদগ্রীব কেন?

আখতারুজ্জামান ইলিয়াস বাংলাদেশকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পরিবর্তে সেনা প্রজাতন্ত্র নামে অভিহিত করেন। সেনা প্রজাতন্ত্র সরকারের একজন প্রধান সচিব হিসাবে সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রজ্ঞাপন সার্কুলার করেন। তারিখ ২৩-১১-১৯৮৯। লিখিত প্রজ্ঞাপনটি তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপানোর জন্য পাঠান। বাংলাদেশের কোনো পত্র পত্রিকা প্রজ্ঞাপনটি ছাপানোর সাহস পান না। 'শতবর্ষী' সম্পাদক এ ব্যাপারে একটি দুঃসাহসিক ভূমিকা রাখার চেষ্টা করলেও এর সম্পূরক সম্পাদক ও প্রকাশক নানা প্রসঙ্গ টেনে অপারগতা প্রকাশ করেন। এদের বেশী ভয় পাওয়ার পিছনে কারণ ছিল বছর দশেক আগে 'ও' নামে একটি সংকলনে সরকারের বিপক্ষে কিছু বিরূপ মন্তব্য থাকার কারণে তারা সামরিক সরকারের রোষানলে পড়ে এবং দৈহিক অত্যাচারের শিকার হয়।

প্রজ্ঞাপনটিতে বলা হয় - "সেনা প্রজাতন্ত্রী সরকার মনে করে যে স্বাধীনচেতা শব্দটি অস্বস্তিকর। গত কয়েক বছর ধরে শব্দটি দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে আসছে। এই অস্বস্তি এবং বিভ্রান্তি দূর করার লক্ষ্যে আগামী দশকের ১ম দিবস ১লা জানুয়ারী থেকে শব্দটিকে বেয়াদব শব্দের সমার্থক বলে গন্য করার জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপ্রভুর সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, পরিদপ্তর ও অধিদপ্তরের প্রতি কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি চর্চা প্রবন্ধে তিনি বলেন - বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের অধিকাংশ আসেন নিম্নবৃত্ত পরিবার থেকে। এরা স্পর্শকাতর এবং অনুভূতিপ্রবণ। এদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দেখাশোনা ও স্পর্শকাতর চেতনার সাহায্যে সমাজের শোষণের রূপটি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়। চুরি, ছ্যাঁচরামি, বদমাইসি ও জালিয়াতি এদের স্বভাবে অনুপস্থিত বলে শোষণমুক্ত ও সাম্যবাদী সমাজ গঠনের জন্য তারা স্থির সংকল্পে স্থিত হয়। সুবিধা ভোগের প্রবণতা তাদের কাছে অপরাধ বলে গন্য হয় বলেই সাম্যবাদী সমাজ গঠনের আন্দোলনে তারা স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বুদ্ধ হয় ও যোগদান করে। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষদের রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত করা এই বামপন্থি কর্মীদের আয়ত্বের বাইরে থেকে যায়। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময়ও অবস্থাটা একই রকম থেকে যায়। নিম্নবিত্তের জীবন যেটুকু আমাদের বাংলা সাহিত্যে এসেছে সেটুকু কেবল মাত্র বাইরের ছবি। স্থির চিত্রের বেশী মাত্রা তাদেরকে দেয়া যায় না।"

"রাজনীতি যাঁরা করেন তাঁদের কাছে মানুষের একমাত্র পরিচয় ভোটার হিসেবে। বামপন্থী রাজনীতিবিদের কাছে শ্রমজীবি মানুষ হলো হাতিয়ার। পাকিস্তানীদের নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করা লেখা বন্ধ হওয়ায় ইলিয়াস অতি মাত্রায় ক্ষুব্ধ হয়ে লিখিত অভিমত প্রকাশ করে বলেন - সরকার পরিবর্তন খুব জরুরী ছিল। দেশের অধিকাংশ মানুষই হয়তো আমার মত তা-ই চাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সংবিধান অনুসারে ভাইস প্রেসিডেন্ট স্থলাভিষিক্ত হবেন। সংবিধানকে পদদলিত করে এমন এক ব্যক্তি ক্ষমতায় বসলেন যিনি প্রথম প্রদক্ষেপেই জাতীয় দলিলকে অস্বীকার করে শপথ গ্রহণ করলেন। সে সময় জিয়াউর রহমান ও একই কথা বলেছিলেন। পাকিস্তান পন্থী সরকার ক্ষমতায় বসে পেশাদার ঠ্যাঙাড়েদের লেলিয়ে দেয় পথে ঘাটে। স্বাধীনতা বিরোধী আর সমাজ কাঠামো বদলে দেয়ার জন্য যে সব বড় বড় নেতাদের হাঁক ডাক শুনে একদিন মহামানব বলে গণ্য করেছি তারা অর্থকড়ি বানানো আর ডান্ডার ভাগ নেয়ার লোভে নিজেদের পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিক্রি করে দিল সামরিকায়নদের কাছে। যে জিভ আগুনের শিখা হয়ে জ্বলতো সেই জিভ এখন মালিক হুজুরের স্তুতিতে ব্যস্ত। পূর্ববর্তী সরকারের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাজনৈতিক শত্রু জাসদ নিধনে এই ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী আরও নিষ্ঠুর ভূমিকা পালন করে। এরা পূর্ববর্তী সরকারের দুঃশাসন খতমের নামে প্রগতিবাদীদের সমূলে খতম করে দিল। আর আমাদের বুঝানো হলো - আমরা দুঃশাসন থেকে জনগণকে মুক্তি

দিচ্ছি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলও জনগণকে মুক্তি দেয়ার জন্য গনবাহিনী তৈরী করে তৎকালীন সরকারকে উচ্ছেদ করার নিমিত্তে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। সেই থেকে এখন পর্যন্ত মানুষ ওই একইভাবে বুঝে আসছে।

যে সব নেতাগণ একদিন মানুষের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন তারাও ঠ্যাঙাড়ে বাহিনীর সংগে বনে যান লুটেরা লুম্পেন। মধ্যযুগীয় নর খাদকদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার জন্য মরণপন যুদ্ধে নেমেছিল সমগ্র দেশবাসী। আর একদল মা, বোন, বৌদের ভোগ করার জন্য নরখাদকদের হাতে তুলে দিয়েছিল ধর্ম বিশ্বাসে। পাকিস্তানীদের হয়ে ক্ষমতা দখলের কী সদর্প আয়োজন। আসলে স্বৈরশাসন উৎখাতের নামে পাকিস্তানের দালালেরাই কি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলো? এরা আমার মত ক্ষুদ্র লেখকদের স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার পর্যন্ত খর্ব করলো?" এ অপমান আখতারুজ্জামান তাঁর জীবদ্দশা পর্যন্ত ভুলতে পারেননি - এই অপমান বারবার উচ্চারিত হয়েছে সময়ে অসময়ে আখতারুজ্জামানের লেখায় ও মুখে। "পেশাদার ঠ্যাঙাড়ে, ক্ষমতা পাকাপোক্ত করে। স্বাধীনতা বিরোধীরা আরও নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা পায়। লেলিয়ে দেয়া ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে যারা নিরন্ন, যাদের পরণে জামা নেই, যাদের হাতে হাতিয়ার নেই, এই সব দেশবাসীর উপর। কিছুদিন খুব তেড়ে মানুষ মেরে হয়রান হয়ে পড়লে রিমোট কন্ট্রোল থেকে মালিক হুজুর তু তু করে হুকুম ছাড়ে। ঠ্যাঙাড়েরা তখন ট্যাংকের উপর থেকে গণতন্ত্র বিলি করে।" (আমি ও আমার সময়)

"ঠ্যাঙাড়ে জানোয়ারটির ক্রমেই দাপট বাড়ে। আমার সময়ের দেয়ালের ওপার দেখার আর কোন সুযোগই সে আমাকে দেয় না। প্রথমে তার হাত থেকে বাঁচার জন্যে গা ঝাড়া দিই। তাকে শুয়োরের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা বলে খিস্তি ঝাড়ি। শূয়োরের বাচ্চা যাবে না, আমারতো মরণ দশা। তাই সমস্ত শক্তি দিয়ে রুখে দাঁড়াতে চাই। রফিক আজাদের মত ইতর জীবটিকে আমি হাতি বলে ভুল করেছিলাম। প্রজন্মকে পাকিস্তান প্রীতির এন্টিডোট খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি সব তাঁর ধারালো দাঁতে কেটে কুটে শেষ করে ফেললো। এটাকে শেষ করতে পারি কি নাই পারি মরিয়া হয়ে আমাকে একবার লাগতে হবেই। ভবিষ্যত আমার এই টুটা ফাটা পঙ্গু ও রুগ্ন সময়কে সেই ইতর জীবটির সংগে লড়াই করার সময় বলে চিহ্নিত করবে।" (আমি ও আমার সময়)

চিলেকোঠায় উপন্যাস ছাপা বন্ধ হওয়ার পর আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের এই প্রতিক্রিয়ায় দেশের প্রায় সকল বিদগ্ধজনকে দারুণ ভাবে হতাশা ও বিক্ষুদ্ধ করে। এরপর আখতারুজ্জামান ইলিয়াস উপন্যাস লেখা বন্ধ রেখে ছোট গল্প প্রকাশের দিকে হাত বাড়ান। ১৯৭৬ সালের মে মাসে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় "অন্য ঘরে অন্য স্বর"। প্রকাশক অনন্যা। উৎসর্গ মা মরিয়ম ইলিয়াস। ১৯৭৫ সনে কবি আল মাহমুদ তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'পানকৌড়ির রক্ত' আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ও মাহমুদুল হককে উৎসর্গ করেন। অন্য ঘরে অন্য স্বরের রচনা কাল ১৯৬৫-১৯৭৫। অন্ত র্ভূক্ত গল্প : নিরুদ্দেশ যাত্রা, উৎসব, প্রতিশোধ, যোগাযোগ, ফেরারী, অন্য ঘরে অন্যস্বর। রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'সংবর্ত' নামক লিটল ম্যাগাজিনে আখতারুজ্জামানের গল্পের উপর সমালোচনা করেন কথা সাহিত্যিক হাসান আযিযুল হক। আবুল হাসান সম্পাদিত 'গণ সাহিত্য' পত্রিকায় (৫ম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, ১৯৮৩) আলোচনা করেন মাহবুবুল আলম। "দৈনিক সংবাদ" এ আলোচনা করেন সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়। সাপ্তাহিক 'বিচিত্রায়' সমালোচনা করেন মুনতাসির মামুন। "সমকাল" এ আলোচনা করেন আবুল হাসান। এবং মাজহারুল ইসলাম আলোচনা করেন 'দৈনিক বাংলায়।' সৈয়দ শামসুল হক টেলিভিশনে আলোচনা করতে গিয়ে বইটির প্রচুর প্রশংসা করেন। সেই সঙ্গে তিনি বইটি পাঠকদের সংগ্রহে রাখারও অনুরোধ করেন। টেলিভিশনের শ্রোতারা ওই অনুরোধে সাড়া দিয়েছিলেন বলে আখতারুজ্জামানের মনে হয়নি। আলোচনা অনুষ্ঠানটি দেখার সৌভাগ্যও তার হয়নি তবে তিনি শুনেছিলেন যে সৈয়দ শামসুল হক টেলিভিশনে বইটির অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তখন পর্যন্ত আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের সংগে সৈয়দ শামসুল হকের কোন পরিচয় ছিল না। আব্দুল মান্নান সৈয়দের একটি উপন্যাসে বইটির নাম উল্লেখ হয়। মাজহারুল ইসলাম দৈনিক বাংলায় আলোচনা করতে গিয়ে ইলিয়াসের লেখার দূর্বল দিকগুলো নিপুনভাবে তুলে ধরেছিলেন। মাহবুবুল আলম লিখেছিলেন - আখতারুজ্জামান মানুষের ক্ষয়ের কথা বললেও বইটি ট্রাজেডী হতে পারেনি। এগুলোকে বড় জোড় এলিজি বলা চলে। 'অন্য ঘর অন্য স্বর' গল্প গ্রন্থটির জন্য ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ লেখক শিবির হুমায়ুন কবির সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। সাপ্তাহিক 'রোববার' ১৯৮১ সালে চিলেকোঠার সেপাই ধারাবাহিকভাবে ছাপার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে চিলেকোঠার সেপাই প্রকাশ সমাপ্ত হয়। এর কিছুদিন পর আখতারুজ্জামানকে তার সমগ্র গল্পের উপর বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার প্রদান করে। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত

হয় তাঁর ২য় গল্প গ্রন্থ “খোঁয়ারী”। প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর। উৎসর্গ: রণজিত পাল চৌধুরী। অন্তর্ভুক্ত গল্প: খোঁয়ারী, অসুখ বিমুখ, তারা বিবির মরদ পোলা ও পিতৃবিয়োগ।

১৯৮৪ সালে তিনি বাংলাদেশ লেখক শিবিরে যোগদান করেন। একই বছরের মে মাসে তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্রে সহযোগী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। তাঁর তৃতীয় গল্পগ্রন্থ ‘দুধভাতে উৎপাত’ প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। প্রকাশক মওলা ব্রাদার্স। উৎসর্গ ফিরোজ হোসেন। অন্তর্ভূক্ত গল্প মিলির হাতে ষ্টেনগান, দুধভাতে উৎপাত, পায়ের নিচে জল, এবং দখল। ১৯৮৬ সালে অক্টোবর মাসে ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড। উৎসর্গ পিতা বি.এম. ইলিয়াস। ১৯৮৭ সালে তিনি ‘আলাওল সাহিত্য পুরস্কার’ লাভ করেন এবং এ বছরের জানুয়ারী মাসে তিনি শিক্ষা অধিদপ্তরে উপ-পরিচালক পদে নিযুক্তি পান। এ বছর তার পিতৃবিয়োগ ঘটে এবং এ বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি সরকারী সংগীত মহাবিদ্যালয়ে উপাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। ১৯৮৮ সালের ৪৫ তম জন্ম দিনে তাঁর ডায়াবেটিস ধরা পরে। “অন্য ঘরে অন্য স্বর” বইটির ২য় সংস্করণ এবছর প্রকাশ করেন ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড। লেখক শিবির আয়োজিত “বাংলাদেশের শিক্ষা: অতীত বর্তমান ভবিষ্যত।” শীর্ষক সেমিনার আয়োজনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত হয় তার তৃতীয় গল্প গ্রন্থ ‘দোজখের ওম।’ প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেন প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা। বইটি প্রয়াত ছাত্র ও বন্ধু হেলাল উদ্দিনের স্মৃতিতে নিবেদিত হয়। অন্তর্ভূক্ত গল্পগু: কীটনাশকের কীর্তি, যুগলবন্দী, অপঘাত ও দোজখের ওম। এ বছরই খোঁয়ারীর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে। ১৯৯০ সালে সম্পাদনা করেন বাংলাদেশের শিক্ষা: অতীত বর্তমান ভবিষ্যত গ্রন্থখানি। ১৯৯১ সালে তিনি আক্রান্ত হন জন্ডিস রোগে। ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাহিত্য পত্রিকা ‘তৃণমূল’ এর ১ম সংখ্যা তারই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। এবছরই চট্টগ্রামের এজাজ ইউসুফী সম্পাদিত ‘লিরিক’ আখতারুজ্জামান ইলিয়াস সংখ্যা প্রকাশ করে। ১৯৯৩ সালের আগষ্ট মাসে প্রকাশিত হয় ‘চিলেকোঠার সেপাই’ এর ২য় সংস্করণ। আখতারুজ্জামানের পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তিতে ১৯৯৩ সালে কোলকাতা থেকে প্রকাশক “একুশে” তাঁর গল্পের গল্প সংগ্রহ প্রকাশ করেন। বন্ধু মুহম্মদ মোজাদ্দেদকে তিনি এই বইখানি উৎসর্গ করেন। বাংলাদেশে মিশন আয়োজিত “গ্রন্থমেলা ১৯৯৩ কোলকাতা” অনুষ্ঠিত সেমিনারে তিনি প্রতিনিধিদলের সদ্য হিসেবে অংশ গ্রহন করেন। কোলকাতায় গ্রন্থ প্রকাশনা সংস্থা ‘প্রতিভাস’ চিলেকোঠার সেপাই প্রকাশ করেন এ বছরেরই জুন মাসে। ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় আগষ্ট মাসে।

১৯৯৪ সালে ‘দৈনিক জনকন্ঠের’ সাহিত্য পাতায় এবার ‘খোয়াব নামা’ ধারাবাহিকভাবে ছাপা শুরু হয়। কিন্তু ‘জনকন্ঠ’ও বেশীদূর এগুতে পারে না। মাত্র ২৫ কিস্তি ছাপার পর সরকারী চাপের মুখে ‘দৈনিক সংবাদের’ মত জনকন্ঠ ও খোয়াবনামা ছাপা বন্ধ করে দেয়। এ ব্যাপারে আখতারুজ্জামান তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। নন্দন পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন - আমার খোয়াবনামা ছাপা তারা বন্ধ করেই ক্ষান্ত হলো না, স্বাধীনতার বিরোধীরা তখনকার সরকার প্রধানকে দিয়ে ব্লাসফেমি আইন পাশ করানোর পদক্ষেপও গ্রহণ করলো, বাংলাদেশ লেখক শিবিরের উদ্যোগে আমরা এই আইন পাশ করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করলাম, সমাবেশ করলাম। পাকিস্তানকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করার কারণে ‘দৈনিক জনকন্ঠ’ আমার লেখা ছাপা বন্ধ করে দেয় কিন্তু এই ঘটনা আমাকে একটুও মর্মাহত করে না। এমনকি বিস্ময় বোধও করি না আমি। তবে এদেশের মানুষ সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে আমি নিরাশ হয়ে পড়ি। জাহানারা ইমাম যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে আন্দোলন করেন। গণআদালতে নাগরিকত্ব হারানো গোলাম আযমের বিচার অনুষ্ঠান করে সরকারকে তা কার্যকর করার চাপ দিলেন এবং সেই সংগে অন্যান্য যুদ্ধাপরাধীদের বিচারও দাবি করলেন। কিন্তু যুদ্ধপরাধীদের বিচারের দাবিকে উপেক্ষা করে সরকার প্রধান যুদ্ধাপরাধীদেরকেই নাগরিকত্ব প্রদান করে উল্টো জাহানারা ইমামের উপর রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করলো। এটা পরিতাপের বিষয় নয় তবে জাতি হিসেবে বাংগালী জাতির জন্য লজ্জার বিষয়। পৃথিবীর সর্বত্র যখন এখন পর্যন্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চলছে তখন আমরা এই বাঙালি জাতিরা ঘটা করে সামাজিক রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ভাবে যুদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন করছি। যাঁরা এই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবী করেছে তাঁদের বিরুদ্ধে ক্ষমতাসীন দলও রাষ্ট্রদ্রোহী মামলা দায়ের করেছে। বাংলাদেশদ্রোহী ব্যক্তিবর্গ আবার প্রতিবাদকারীদের বাসভবনও আক্রমন করেছে। বাংলাদেশদ্রোহীরা পুনর্বাসন ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার ফলে ভয়ানক দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিও এর দাবীকারকদের উপর তারা ক্রমাগত আক্রমন চালাচ্ছে। এদের ভয়ে অনেক মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবীকারীদেরকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। পাকিস্তানপন্থী সরকার ক্ষমতাসীন হলেও আমাদের

দেশে এই সরকারের মুলচালিকা শক্তি কারা এটা বুঝে উঠলেও আমাদের কিছু করার থাকছে না। তারা মন্ত্রিত্ব নেয় না কিন্তু সব কিছু ঠিক করে দেয় এমনকি কাকে কোন মন্ত্রী করা হবে তাও তারা বলে দেয়। প্রতারিত ও অশিক্ষিত এই জনগন ঠিক জানে না যে তারা কিভাবে ভোট দিয়ে স্বাধীনতা বিরোধীদেরই ক্ষমতায় বসাচ্ছে।

"জনগনের সাথে রাজনৈতিক দল দুটির এটা কত বড় প্রতারণা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জামাতীদের আক্রমনে এক রাতে ৬৫ জন ছাত্র মারা যায়। সরকারী ছত্র ছায়া না থাকলে এই স্বাধীন দেশে এত দুঃসাহস তারা পায় কোথা থেকে। তাদের পরবর্তী লক্ষ্য ছিল কথাশিল্পী আজিজুল হক। নিজেরতো ছিলই হাসান ভাইকে নিয়ে তখন খুব দুঃশ্চিন্তায় ছিলাম। রিঅ্যাকশনারী পাকিস্তানীদের ভূমিকা কি কম? যেমন আনোয়ার জাহিদ, গিয়াস কামাল চৌধুরী ও আরো অনেকে। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার দাবীকারী ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন স্বাধীনতা বিরোধীদের বাড় বাড়ন্তাকে প্রচন্ড ভাবে আঘাত হেনেছিল। এমনকি স্বাধীনতার স্বপক্ষ দলের বিপরীত মানুষদেরও তিনি এক মঞ্চে এনেছিলেন। কিন্তু সরকারের যদি নিজস্ব অবস্থান থাকতো তা হলে তারা কখনই স্বাধীনতা বিরোধীদের পুনর্বাসন করতো না। পাকিস্তানকে নিয়ে ঠাট্টা মস্করা করা লেখা ছাপালে তাদেরতো কোনো ক্ষতি নেই। তারা আমার লেখা ছাপা বন্ধ করবে কেন? শেখ মুজিবকে তা হলে হত্যা করে এই পাকিস্তান পন্থীরা এবং যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তারা পাকিস্তানীদের মনোনীত? এবং এদের প্রধান কাজ হলো পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষা করা। পাকিস্তান যাতে কোন ভাবেই দুঃখ না পায়, সে চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখেনা এরা। আমরা কি এটাই চেয়েছিলাম? যে পাকিস্তানীদের আমাদের ঘাড় থেকে নামানোর জন্য এত রক্তক্ষয় মাত্র সাড়ে তিন বছরের ব্যবধানে আবার তারা? আমরা জাতি হিসেবে কতবড় অকৃতজ্ঞ, পাকিস্তানীদের দুএকটা গালি দেব, তাও এরা দিতে দিবে না। আমরা পাকিস্তানীদের গালি দিলে এদের বুকে ব্যথা হয়, প্রভূরা মন ভার করে, তাদের ব্যাজার মুখ দেখলে আমাদের বাংগালী সেবাদাসদের ভাত হজম হয় না।" (নন্দন)

"সরকারী কলেজের অধ্যাপক হওয়ার কারণে বাকশালে যোগদানের চাপ থাকলেও আমি, যোগদান করিনি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতাচ্যুত হোক এটাও মনে প্রাণে চেয়েছি। তাই বলে সেনা বাহিনী? এক লুটেরা লুম্পেনদের বদলে আরেক ডিকটেরশীপ। আগে তো মাঠে ময়দানে সভা করে লেখালেখি করে মত প্রকাশ করা যেত। এখন সভাসমিতি দূরের কথা, কথা বলতেও মার্শাল ল'দের অনুমতি নিতে হয়। সেই মার্শাল ল এর ব্যক্তিবর্গও পাকিস্তানের মনতুষ্টি করে দেশ চালায়। পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে কথা বললে মসনদ টলে পড়বে এটাই এখন আমাদের শাসকদের ভয়। ১৯৭৫ সনে চিলে কোঠায় যে ভয় ছিল আজ বিশ বছর পর ১৯৯৫ সনেও একই ভয়। 'দৈনিক সংবাদ' যে চাপের মুখে ১৯৭৫ সনে চিলেকোঠায় ছাপা বন্ধ করে দিয়েছিল সেই একই চাপের মুখে দৈনিক জনকন্ঠও খোয়াবনামা ছাপা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। আমরা আবাল-বৃদ্ধ বনিতারা বুঝে আছি স্বৈরাচার আওয়ামী লীগকে হটানো হয়েছে। আসলে তাদেরকে হটিয়ে পাকিস্তানের তোষামোদকারী সরকার ক্ষমতায় বসেছে এবং বিগত বিশ বছর ধরে তারা দেশ শাসন করছে। মধ্যযুগীয় রক্তপিপাসুদের বিরুদ্ধে এরা একটি কথাও উচ্চারণ করবে না। তাদের কাছে আমাদের সম্পদের হিসাবও চাইবে না। তাহাদেরকে আদর করিয়া তোষামোদ করিবে। নিয়ম বহির্ভূত কিছুই হইতে পারিবে না। তাহাদের বিরুদ্ধে কখনও কিছুই বলা চলিবে না। 'চিলেকোঠায়' ছাপা বন্ধ হইবে। 'খোয়াবনামা' ছাপা বন্ধ হইবে। কথা বলিলে ভারতের চর আর 'র' এর এজেন্ট হিসেবে চিহ্নিত হইব।" "আমি যদি সরকার বিরোধী হই তাহলে আমাকে গ্রেফতার করিয়া জেলে ঢুকায় না কেন? এর রকম কাজ সরকার করিবে না। গোপনে চাপা মার দেবে। যেন জনগণ একটুও আঁচ করিতে না পারে। আঁচ করিলে জনগন প্রশ্ন তুলিবে, পাকিস্তানকে গালি দিলে আমাদেরকে কেনো জেলে যাইতে হয়?" পাকিস্তানের ইচ্ছামত সব কিছু চলিতেছে জনগনকে ইহা কিছুতেই বুঝিতে দেওয়া হইবে না। প্রজন্ম বিভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে, এখন তাহারা কত সহজে বলিয়া বসে - পাকিস্তান তো মুসলিম দেশ - তারা আমাদের ভাই।"

১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। সে সময় তাঁর মার প্যানক্রিয়াসে ক্যান্সারের জোর সম্ভাবনা। আখতারুজ্জামান যথেষ্ট ভেঙ্গে পড়েন। তখন তাঁর পায়ের ব্যথা খারাপ অবস্থার দিকে মোড় নিয়েছে। তাঁর অসহনীয় কষ্টের কথা তিনি পরিবারের কাউকে বুঝতে দেন না। কনটিনিউ ব্যথার ঔষধ খাচ্ছেন। ক্যান্সারে গরম স্যাঁক দেয়া একেবারেই নিষেধ এটা না জেনেই ডাক্তার তাঁকে গরম পানির স্যাঁক দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন। নভেম্বর মাসে আখতারুজ্জামান তাঁর মার চেহলাম সেরে ভাই খালেকুজ্জামান ডিলুর সংগে ঢাকা ফিরছিলেন। বাসের ক্যাসেটে তখন

- ‘ওই মহা সিন্ধুর ওপার থেকে কী সংগীত ভেসে আসে’ বাজছিল, আনন্দ উচ্ছ্বল মানুষটির চোখে এই প্রথম জল দেখে ডিলু অস্থির হয়ে পড়েন। গানটি থামলে ডিলু দেখেন ইলিয়াস হাতের তর্জনী দিয়ে নিঃশব্দে চোখের জল মুছে যাচ্ছেন।

সাংগঠনিক কাজ সৃজনশীলতাকে কতখানি উস্কে দিতে পারে সে কথা খুব ভালভাবে বিশ্বাস করতেন ইলিয়াস। মায়ের সেবার মধ্যে নিজের ব্যথা লুকিয়ে রেখেও শেষ সুবিধা করতে পারেননি তিনি। মার চেহলাম সেরে ঢাকায় ফেরার পর তার সময় হলো চিকিৎসা নেয়ার। ততদিনে তিনি ডান দিকে কাত হয়ে হাঁটা শুরু করেছেন। বোন স্ক্যান করে ঘাতকব্যাধি অষ্টিও সারকোমা সন্দেহ করলেন ডাক্তার। আর তখনই তার অবহেলিত ব্যথার গুরুত্ব টের পায় সকলে। তখনও তিনি খোয়াবনামার প্রুফ দেখা নিয়ে খুবই ব্যস্ত। প্রেস থেকে তাঁর ঘরে ফর্মা আসে। তিনি সারাক্ষণ শুয়ে বসে সেই ফর্মা কাটাকুটি করেন প্রুফ দেখেন। এই সময় ডাক্তাররা তাঁকে সিটি স্ক্যান করতে ও কোলকাতা যেতে উপদেশ দেন। পাছে খোয়াবনামা বের হতে দেরী হয় ভেবে আখতারুজ্জামান জীবন বাজী রেখে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের শেষ প্রুফটি দেখে দেওয়ার পর কোলকাতা যান।

আখতারুজ্জামানের জন্মের বছর ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে বাংলার লক্ষ লক্ষ মানুষ স্রেফ না খেতে পেয়ে মারা যায়। আমি ও আমার সময় প্রবন্ধে ১৯৫১-৫২ সন সম্পর্কে তিনি লিখেছেন - পাকিস্তান অর্জনের স্বাধীনতা যে বাংগালীর মুক্তিকে সংগে করে আনেনি তা বুঝতে এদেশের মানুষের খুব বেশী সময়ের প্রয়োজন হয়নি। দেখতে দেখতে ভাষা আন্দোলন নূতন করে নাড়া দিলো। তখন আমি ক্লাশ ফাইভে পড়ি। মানুষের বিক্ষোভের মাত্রা দেখে বুঝতে পারি যে দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ধাক্কাটা লেগেছিল নূতন রাষ্ট্রের ভিত্তিতে - যেখানে চিড় ধরে তখনি। সেই ভাষা আন্দোলনের শুরুতেই। কৈশোর পার হয়ে সদ্য কলেজে ঢুকছি। ওই যে সে সময় সেনাবাহিনীর থাবার নিচে পড়লাম - সারাটা যৌবন গেলো সেই সাঁড়াশির ভেতর - আজও তা থেকে রেহাই মিললো না। মার্শাল ল’র জগদ্দল পাথরে চাপা পড়ে যে কিশোর পরিণত হলো যুবকে যৌবনকাল পার করে দিয়ে আজ সে পক্ক কেশ পৌঢ়। তার বৃদ্ধি কি আর পাঁচটা দেশের মানুষের মত হতে পারে!”

‘আইউব খানকে হটানো ছাড়া মানুষের সেই বিক্ষোভ আর কোনো লক্ষ্য স্থির করতে পারে না। চিলেকোঠার সেপাইয়ে তিনি তাঁর অভিব্যক্তি এভাবে বর্ণনা করেন : কয়েকটি বই পোড়ালে আইউব খান মরে না। এক আইউব খান গেলে আরেক আইউব খান আসবে। ওয়েষ্ট পাকিস্তানের সব আইউব খানকে শেষ করলে বাংগালীদের মধ্যে নতুন আইউব খান এমার্জ করবে।’

পুরনো ঢাকার মত বগুড়া সাহিত্য পাড়ার সংগে তাঁর ছিল গভীর আত্মীয়তা। মাতৃভক্তি পিয়াসী একজন সাধারণ সন্তানের মত হিসেবে সময় অসময়ে বগুড়াতেই তিনি সময় কাটাতেন বেশী। কাঁধে কাপড়ের ব্যাগ, কাগজপত্র, বই খাতা, কলম, তামাক ও তামাক পাইপ। বনেদী পরিবারের সন্তান হিসেবে তাঁর ভেতরে অহংবোধের মাত্রা বলতে কিছুই ছিল না। বাবা এ.বি.এম ইলিয়াস সফল রাজনীতিবিদ ছিলেন বলেই রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁকে মানুষ হতে হয়েছে। রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বড় হওয়া সত্তেও ইলিয়াস এর বিপরীত মানসিকতায় মানুষ হয়েছেন। তাঁর সাক্ষাতকারে, গল্পে, প্রবন্ধে উপন্যাসের বিবরণীতে এটা খুব বেশী স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। বগুড়ার ‘দৈনিক করতোয়া’ ‘দৈনিক মুক্তিবার্তা’ ‘সাপ্তাহিক বর্তমান’ ‘প্রেস ক্লাব’ ‘শতবর্ষীর’ অফিসগুলোতেই তিনি আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতেন বেশী। আমরা যাঁরা তাঁর আড্ডার সংগী ছিলাম বিশেষ করে কবি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মনোজদাস গুপ্ত, কাজী রব, রেজাউল করিম চৌধুরী, ষাটের দশক থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে সাহিত্য পত্রিকা ‘বিপ্রতীক’ এর ফারুক সিদ্দীকি রায়হান রহমান, শোয়েব শাহরিয়ারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান কলামিষ্ট মনজুরে মওলা সে সময় বগুড়ার ডিসি ছিলেন। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের আব্দুল্লাহ আবু সাঈদ বন্ধু মঞ্জুরে মওলার নিকট প্রায়ই বেড়াতে আসতেন। এদের সংগে যোগ দিতেন অধ্যাপক মোস্তফা নূরউল ইসলাম। এই আড্ডা গুলোতে তিনি যে সব বিষয় নিয়ে কথা বলতেন তার মধ্যে প্রথমেই প্রাধান্য পেতো বর্তমান রাজনীতি ও সরকার এবং সামরিক শাসনের যাঁতাকল। “আমরা কি অহরহ পিষ্ট হচ্ছি?” ইলিয়াসের এই অভিযোগ তখন আমার কলেজ পড়ুয়া মগজ খুব একটা গ্রহণ করতে পারতো না। তিনি প্রায়শঃ উল্লেখ করতেন মাত্র সাড়ে তিন বছর সময় আমি মুক্ত জীবনের অধিকারী ছিলাম স্পষ্টতই: শাসক হিসেবে ব্যর্থ বঙ্গবন্ধুর শাসন কালের কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন। ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা বাটা কোম্পানীর

আর্টিষ্ট টগবগে যুবক জাহিদ হোসেন নিজেকে ধরে রাখতে না পেরে এক সময় তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন - আপনি বুঝি শেখ মুজিবের শাসন আমলের কথাই বলছেন? সে সময়ওতো রক্ষী বাহিনী ছিল? তিনি জবাব দিলেন - রক্ষী বাহিনী আর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলকারী সেনাপ্রধানদের সেনা শাসনকে তুমি এক করে দেখছো কেনো জাহিদ?

সমগ্র সমাজের পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং নিজের গভীর বোধ থেকে তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে কথা সাহিত্যের পাশাপাশি একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলা তার একটি প্রধান কাজ। অবশেষে তিনি বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সংগে সক্রিয় ভাবে জড়িত হন। এবং অল্প কিছু দিনের মধ্যে প্রধান ভূমিকা পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন সুস্থ সমাজের জন্য অনিবার্য সুস্থ সংস্কৃতি। এবং এই প্রেরণাতেই বাংলাদেশ লেখক শিবিরের প্রতি ছিল তার দৃঢ় আস্থা। দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছেন সাংগঠনিক মেধা ব্যয় করে। ততদিনে চিলেকোঠার সেপাই বেরিয়ে গেছে। লেখক শিবিরের সাংগঠনিক কাজে কোথায় তিনি যাননি - বাঁশখালি, চকরিয়া, কক্সবাজার পর্যন্ত। বদরুদ্দিন ওমর, হাসান আযিযুল হক, আসহাব উদ্দিন আহমেদ, আনু মুহম্মদ, ইয়াকুব আলী মোল্লা শোয়েব শাহরিয়ার আরও আরও অনেককে নিয়ে কখনও রিক্সায় কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও লক্কর ঝক্কর বাসে চেপে পথের ক্লান্তি গাড়ীর ঝাঁকুনি সব সব সহ্য করে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত তিনি লেখক শিবিরের কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি লেখক শিবিরের সদস্য হন এবং ওই বছরই তিনি কেন্দ্রীয় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে হাসান আযিযুল হক হন সভাপতি, আখতারুজ্জামান নির্বাচিত হন সহ-সভাপতি। ১৯৯২ সালে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নেতৃত্বে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি শুরু হয়। ওদিকে বিজেপি মৌলবাদীরা বাবরী মসজিদ ভেংগে আমাদের দেশের মৌলবাদীদের অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ করে দেয়। মৌলবাদীরা আক্রমন করে বামদল ও ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অফিস। তসলীমা নাসরীনের প্রয়োজনহীন অসাড় লেখাকে কেন্দ্র করে লেখকদের মুরতাদ আখ্যা দেয়া হয়। ব্ল্যাশফেমী আইন প্রবর্তনের দাবীতে মৌলবাদীদের মাঠ গরম অবস্থা তখন প্রধান দৃশ্য। আইনটি পাশ করানোর পরিবেশ তৈরীর আয়োজন চালাচ্ছিল তারা সর্বশক্তি নিয়োগ করে। দম আটকানো এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য আখতারুজ্জামান সাহসী পুরুষের মত প্রধান ভূমিকা গ্রহন করেন। ব্ল্যাশফেমী আইন প্রবর্তন প্রতিরোধ করার জন্য তিনি লেখক শিবিরের নেতৃত্বে প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করেন। এই প্রতিবাদ সমাবেশের কতখানি প্রয়োজন ছিল দেশের সকল প্রগতিবাদী মানুষই তা অনুধাবন করতে পেরেছিল। সাধারণ মানুষকে এই বিষয়টি অনুধাবন করাতে লেখক শিবির ঘরে ঘরে, অফিসে অফিসে, ঘুরে বোঝাতে থাকেন, কেন প্রতিবাদ সমাবেশে অংশগ্রহন করতে হবে। কয়েক সপ্তাহ একটানা পরিশ্রম করে আখতারুজ্জামান প্রতিবাদ সমাবেশ করেন এবং তিনি সফল হন। মৌলবাদীদের পক্ষে ব্ল্যাশফেমী আইন পাশ করানো আর সম্ভব হয়ে ওঠে না।

১৯৯৬ সালের ১৩ই জানুয়ারী তাঁর পায়ের হাড়ে ক্যান্সার ধরা পড়ে। ২৬শে জানুয়ারী তিনি ক্যান্সারের চিকিৎসার্থে কোলকাতা যান। ১২ই ফেব্রুয়ারীর কাছাকাছি সময়ে দীর্ঘ দিনের আনন্দ কষ্ট নিংড়ে নেয়া লেখা 'খোয়াবনামা' প্রকাশিত হয়। ইলিয়াস তখন কোলকাতায়। 'খোয়াবনামা' বইটি উৎসর্গ করেন বন্ধু মাহবুবুল আলমকে।

কেমোথেরাপির ভয়াবহ কষ্ট তাকে সহ্য করতে হয় ১ মার্চ থেকে। ২০শে মার্চ তাঁর ডান পায়ে অস্ত্রপ্রচার করা হয় এবং সম্পূর্ণ বাদ দেয়া হয়। পা প্রস্থানের সংগে সংগে তার পুরো জীবনটাই ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। কোনো কোনো পত্রিকায় লেখা হয় কোলকাতা শহর আখতারের ডান পা ছিনতাই করে নিয়েছে। নার্সিং হোমের অনুমতিক্রমে কোলকাতার এক গোরস্থানে ওই পা খানা কবরস্থ করা হয়। অপারেশনের আগে ও পরে আনন্দের অধিক শোক নিয়ে কোলকাতার আরেক অংশ ভেঙ্গে পড়ে। যাবদপুরের ছাত্রেরা রক্তদানের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়ায়। ক্যান্সারের ডাক্তার স্থবির দাস বাবু একজন আদর্শ রোগীর সন্ধান পেয়ে ঘনঘন চোখের কোন মোছেন। ক্যান্সারের বিশেষজ্ঞ এই বিখ্যাত ডাক্তার এক সময় নক্সালবাড়ী আন্দোলনের সংগে যুক্ত ছিলেন। স্থবির, নাজেস, মৌসুমীদের কত পরিশ্রম কত ভালবাসা আখতারুজ্জামান ভেবে কুল পায় না, এত ভালবাসা এরা মানুষকে দেয় কি করে? কোলকাতার কত লেখক অভিজিত, মিহির পৃথ্বিশ এক একজন একটা চরিত্র হয়ে ভেসে ওঠে ইলিয়াসের চোখে। অপারেশনের পর তার মুখে ঘা হয়। ঘন ঘন বমি হতে থাকে। ক্ষুধামন্দা বাড়ে। মাথা ভর্ত্তি সমস্ত চুল সারসের পালকে মত ...। এত সব ঘটনা প্রবাহ কোলকাতার সাহিত্য মহলে, কলেজে, ক্যান্টিনে, এবং কোলকাতার ট্রামের ঘরঘর চাকার ভেতর মিশে যেতে থাকলে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ইলিয়াসের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে ওঠেন কোলকাতার এত ধাড়ী শূয়োর সব বেঁচে

আছে আর আপনাকে আজ মরতে হয়। ঢাকায় তেমন শোরগোল নেই। 'জনকণ্ঠ' 'সংবাদ' 'ভোরের কাগজ' যতটুকু নিবন্ধ ছাপে ততটুকুই। অন্যান্য পত্র পত্রিকার ভাবখানা এরকম - এ শালা মরলে বাঁচলে আমাদের কি?

একেতো দুঃসময় তার উপর আরেক দিক থেকে যুক্ত হয় প্রবল মানসিক চাপ। আনন্দ বাজার গোষ্ঠী 'খোয়াবনামাকে' নির্বাচন করে আনন্দ পুরস্কারের জন্য। দেশে ফিলিপস পুরস্কার সহ সমজাতীয় অনেক দামী পুরস্কারকে ইলিয়াস উপেক্ষা ও প্রত্যাখ্যান করেছেন। আনন্দ পুরস্কার গ্রহণের ব্যাপারেও তিনি প্রত্যাখ্যানের নীতি গ্রহন করেন।

২৬শে ফেব্রুয়ারী কেমোথেরাপীর ২য় দফায় তার আরও অসহনীয় কষ্ট হয়। প্রবল বমি বমি ভাব। কিন্তু হয় না। ঐ দিন বেলা আড়াইটার দিকে ড: আনিসুজ্জামান আসেন। সঙ্গে আনন্দ বাজারের অনিক সরকারের চিঠি। 'প্রফুল্ল কুমার সরকার স্মৃতি' আনন্দ পুরস্কার গ্রহণ করার আমন্ত্রণ। ইলিয়াসের ২য় উপন্যাস খোয়াবনামার জন্য তারা এই পুরস্কার নির্বাচন করেন। পাক-উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উস্কে দেওয়ার পিছনে আনন্দ বাজারের ভূমিকার জন্য সারা জীবন তিনি আনন্দবাজারকে গালি দিয়েছেন। এমনকি খোয়াবনামাতেও আনন্দবাজারের প্রসঙ্গে রয়েছে। আনন্দবাজার সম্বন্ধে বিরূপ কথাই বলা হয়েছে খোয়াবনামাতে। তিনি প্রশ্ন করেন - খোয়াবনামাতে আমি আনন্দবাজারকে গালি দিয়েছি তারা এই বইখানি আনন্দ পুরস্কারের জন্য কিভাবে নির্বাচন করে?"

তিনি আনন্দবাজারকে পরামর্শ দেন তারা যেন বইখানি ভালভাবে পড়ে আনন্দ পুরস্কারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেন। আনন্দবাজারের নিখিল সরকার ইলিয়াসের স্ত্রী তুতুলকে জানান তারা বইটি ভালভাবে পড়েই পুরস্কার দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ড: আনিসুজ্জামান ইলিয়াস বলেন এই পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলে তিনি বিব্রত ও অপমানিত হবেন। পুরস্কার নেয়ার ব্যাপারে তিনি খুব জোর দেন। বলেন, তাঁর চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে ৫০,০০০ টাকা লোন হয়েছে। এ রকম অবস্থায় আনন্দ পুরস্কার যখন ইলিয়াসের পায়ের উপর গড়াগড়ি খায় তখনও তিনি আপোশ করার মনোভাব পরিত্যাগ করতে না পেরে স্বগোক্তি করেন - "এ রকম মধ্যবিত্ত বোধ হয় দুনিয়ার আর কোনো দেশে নেই একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া। ভাসা ভাসা ধারণা নিয়ে দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঘেউ ঘেউ করা হলো এখানকার বুদ্ধিজীবিদের সার্বক্ষণিক তৎপরতা। বিজ্ঞানে ডিগ্রি পাওয়া মানুষ এদেশে ব্যবসা করে ধর্ম নিয়ে। টাকার লোভে, সামাজিক প্রতিষ্ঠার লোভে মধ্যবিত্ত পারে না হেন কম্ম নেই।" যিনি পা কেটে বাদ দিয়েছেন সেই ড: স্থবির দাসও তাঁকে অনুরোধ করেন। অবশেষে স্থবির দাসকে তিনি বলেন - আনন্দ পুরস্কার আমার স্বস্থি ও ঘুম কেড়ে নিয়েছে, কি যে করি।

লিটল ম্যাগাজিন আর তরুণ লেখকদের প্রতি খুব বেশী স্নেহশীল ছিলেন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। আমাদের অনেক তরুণ লেখক আছেন যাঁরা খুব উচুস্তরের লেখকদের লেখা পড়েন না বললেই চলে এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাদের নাম পর্যন্ত তাঁরা জানেন না। সেটা পাঠ্যভ্যাসের দৈন্যতা নাকি তরুণ লেখকদের অনিহা বলা মুস্কিল। মহিবুল আজিজের নাম ক'জনে জানে, তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ বের হয় ১৯৮৮ সালে। বইটির দু'টো রিভিউ বের হয়। একটি চট্টগ্রামের লিরিকে, অন্যটি কোলকাতার 'চতুরঙ্গে।' মামুন হুসাইনের 'শান্ত সন্ত্রাসের চাঁদমারী' যাঁরা পড়েননি তারা কি করে জানবেন তরুণদের ভেতর কত শক্তিশালী গল্পকার তিনি। আমরা হুমায়ুন আহমেদ, এমদাদুল হক মিলনের নাম ঝাড়া মুখস্থ বলতে পারি। আরেক শক্তিশালী গাল্পিক মহিবুল আজিজের নাম আমরা শুনি নাই। ওয়াসি আহমেদকেও আমরা চিনি না। ১৯৯২ সালের অনুষ্টুপের শারদীয় সংখ্যায় যখন মামুন হুসাইনের গল্প 'সনকার চালাবুড়ি ও আমাদের দিন যাপন' বেরোয় তখন কলকাতার উঁচুদরের লেখকগন আরেকবার থমকে দাঁড়ান। মানিক বন্দোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, জ্যোতিরিন্দ নন্দী, বুদ্ধদেব ঘোষের চাইতেও যে বাংলাদেশে অনেক শক্তিশালী লেখক আছেন এটা কোলকাতাবাসীকে আর জানান দিয়ে বলতে হয়না। বিশেষত গল্পের প্রকরণ ও উপন্যাসের গদ্যভংগী নিয়ে ইতোপূর্বে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন আব্দুল মান্নান। সৈয়দ ও মাহমুদুল হক। কমল কুমার মজুমদার সম্পর্কে ইলিয়াস বলেন মানুষের অসহায়ত্ব নিয়ে এ রকম গভীর খনন কার্য কমলকুমার মজুমদার ছাড়া আর কে করতে পারেন। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ সম্পর্কে বলেন - মানুষের অস্তীত্বের গভীর ভেতরে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর সৎ ও একনিষ্ঠ অভিযানের ফলে 'চাঁদের আমাবশ্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো' বাংলাদেশের কথা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। হাসান আযিযুল হকের কাছে সংগ্রাম ও প্রতিরোধ হলো বাঁচার হাতিয়ার। পরিণত দৃষ্টির অতলে তাঁর রচনা অশ্রু বাষ্পাচ্ছন্ন হয় না। সৈয়দ শামসুল হক কাহিনী বর্ণনায় সহজ সচ্ছন্দ ভংগি ব্যবহার করেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সম্পর্কে তিনি বলেন ঘাতক দালাল

নির্মূল কমিটির আন্দোলন ছিল সময়কালের সব থেকে বড় উদ্দীপনাময় আন্দোলন। যাঁরা মুক্তিযুদ্ধ দেখেননি এই আন্দোলনে তাঁদের সংগে তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্পিরিটটা যুক্ত করে দিয়েছেন। ভারতে বিজেপি মুসলমান বিরোধী ভূমিকা নিয়েছে সে তুলনায় বাংলাদেশে জামাত কিন্তু তার বিপরীত অবস্থানে বরং তাঁরা আওয়ামী লীগের নীতি আঁকড়ে ধরে আছে। এই লুকোচুরি খেলা তারা সাধারণ জনগনকে বুঝতে দেয় না। নন্দন পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন যে জামাত ঐ সব ব্যক্তিদের সংগে আঁতাত করে যারা খুব রিঅ্যাকশানারি পাকিস্তান পন্থী। তসলিমা নাসরিন জাহানারা ইমামের মৌলবাদ বিরোধী আন্দোলনে কোনো সাহায্যই করতে পারেনি। তাঁর উপন্যাস 'লজ্জা'র জন্য যদি আমরা তাঁকে কৃতিত্ব দেই, তাহলে উপন্যাস জিনিসটাকে আমরা অনেক নিচে নামিয়ে ফেলব। বিদেশে তসলিমা মেডেল যত পাচ্ছেন, সম্মান কি তত পাচ্ছেন? বেগম রোকেয়া থেকে সুফিয়া কামাল আমাদের দেশের নারী আন্দোলনের যে ধারা রয়েছে সেটাকে তসলিমা নাসরিন এগিয়ে নিতে পারেননি। তসলিমা নাসরিনের লেখায় চমক অনেক বেশী আর তার লেখায় সাম্প্রদায়িকতাকে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাতে মনে হয়েছে এই দেশেটার সব লেখক সাম্প্রদায়িক। মহাশ্বেতা দেবী তার একখানা উপন্যাস ইলিয়াসকে উপহার দিয়েছিলেন। উপহার প্রসঙ্গে তিনি নিজের হাতে লিখেছিলেন - ইলিয়াসের পায়ের নখের তুল্য কিছু লিখতে পারলে আমি ধন্য হতাম। বইখানি পেয়ে ইলিয়াস বলেছিলেন - বিষয়টি আমার জন্য খুব লজ্জার ও অস্বস্তিকর। চিকিৎসা চলাকালীন সময়ে ইলিয়াস যাদবপুরে ফোন করে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছে পোষণ করেন। এর দু'একদিন পর তাঁর পাসপোর্ট হারিয়ে যায়। পরে ফোনে তাঁকে তার অপারগতার কথা জানিয়ে দেন। পরে লোকজনদেরকে ইলিয়াস বলে বেড়াতেন যে পাসপোর্ট হারিয়ে যাওয়ার কারণে মহাশ্বেতা দেবীর সঙ্গে সাক্ষাত করতে পারিনি। মহাশ্বেতা দেবী ব্যাপারটি শুনে বলেছিলেন কোলকাতা থেকে যাদবপুর যেতে কি পাসপোর্টের প্রয়োজন হয়?

পরে মহাশ্বেতা দেবী ইলিয়াসকে দেখতে ঢাকা এসেছিলেন, তাঁর বাবা মনীশ ঘটকও ছিলেন দূর্দান্ত পদের। কাকা ঋতিক ঘটকও কম কিসে। অদ্বৈত্যমল্ল বর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' তাঁরই সৃষ্টি।

হাজার চুরাশির মা, চোট্টিমুন্ডা ও তার তীরের মহাশ্বেতা জন্মগ্রহণ করে ছিলেন ঢাকার ৯৫ জিন্দাবাহার লেনে। বাড়ীটা এখন পুলিশ ফাঁড়ি। ইলিয়াসকে দেখতে এসে নবারুনের মা অর্থাৎ মহাশ্বেতা দেবী ইলিয়াসের ঘরে পা দিয়েই বাহাদুর শা জাফরের দুটি লাইন আবৃত্তি করলেন 'উমরে দরাজ মাগকে লেয়াথা চারদিন। দো আরজুমে কাটায়ে দো এন্তে জারমে।' মহাশ্বেতা দেবী তাঁর মাষ্টার সাহেব জীবনী উপন্যাসখানি আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে উৎসর্গ করেছিলেন - কেন তিনি এই বইখানি ইলিয়াসকে উৎসর্গ করেছেন প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন - 'যোদ্ধা যোদ্ধাকেই শ্রদ্ধা করে। সাহিত্য সংস্কৃতিজ্ঞান, এসবের সামনে সীমান্তের কোনো বাঁধা বন্ধ নেই। এ এক উম্মুখ প্রান্তর। আখতার তুমি আমাকে শিখিয়ে দিয়েছ শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করে যেতে হবে। কলম থামানো চলবে না।' মহাশ্বেতা দেবী চলে যাওয়ার পর আরেক দল লেখক লেখিকা ঘরে প্রবেশ করেন। তাদের নিঃশ্বাসে সমস্ত বাড়ীটা যেন দুলতে থাকে, এরপর শুরু হয় পরিচয় পর্ব। আমি প্রতিভা রায়-ওড়িয়া, আমি হিন্দী কবি অনামিকা, আমি কেরালার লেখক— আনন্দ, আমি অসমিয়া কবিনীলম কুমার, আমিবিবেকশাসন ভাগ। বাকীরা বাংলা ভাষার অভিজিত সেন, অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, সপ্নময়, কিন্নর রায়, ভাগীরথ মিশ্র আরও আরও অনেকে। ইলিয়াস সকলকে বাম হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেন।

চিলেকোঠার সেপাই প্রকাশিত হয়েছে ১৯৮৬ সালে। আর খোয়াবনামা প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। উনসত্তরের ওই দর্পিত সময়ের উম্মত্ততা আসলে ছিল সুস্থ সমাজ নির্মানের পূর্বশর্ত। সেই সময়টায় বাঙালি জাতিকে মাত্র একজন বাঙালির নেতৃত্ব কতখানি রাজনীতিবীদ করেছিলেন তার এক বিশাল চিত্রশিল্প সময়ের দাহ নিয়ে ইলিয়াস উপস্থাপিত করেছেন চিলেকোঠার সেপাইয়ে। চিলেকোঠার সেপাইয়ে ৭৪ এর দূর্ভিক্ষ সম্বন্ধে ইলিয়াস লিখেছেন - শায়েস্তার খাঁর আমলে টাকায় আটমন চাল থাকা সত্ত্বেও না খেতে পাওয়া মরা মানুষ দেখে ওসমান আঁতকে উঠে। ৪০০ বছর ধরে তারা না খেতে পাওয়া মানুষ। দূর্ভিক্ষে মরে দরিদ্র মানুষেরা। কোনো কাজ থাকে না অথচ তারা জমি থেকে উৎখাত হয়। টাকায় আটমন চাল থাকা সত্ত্বেও শায়েস্তা খাঁর আমলে যারা মরেছে তারা দরিদ্র জন গোষ্ঠী। ৪৬ এ যারা মরেছে তারাও শায়েস্তা খাঁর আমলের দরিদ্র জনগোষ্ঠী। ১৯৪৫ এ ২য় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়। ৪৬ এ দূর্ভিক্ষ। চিলেকোঠার সেপাইয়ে কিভাবে ঢাকা শহর থেকে ৬৯ এর গণআন্দোলন গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে, কিভাবে বেড়ে ওঠে নূতন ভৃত্য

গোষ্ঠী, বেসিক ডেমোক্রেসির উৎপাতে চুরি ডাকাতি জোচ্চুরি কিভাবে জন জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে তার একটি বিষদ বিবরণ পাওয়া যায় ইলিয়াসের জীবন ও সময় অন্বিষ্টের দলিল সমৃদ্ধ এই বইখানিতে।

"বেসিক ডেমোক্রেসির আরেকদল মানুষ ৬৯ এর এই আন্দোলনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মূলভিত্তিতে এমনভাবে ধাক্কা দেয় যে তাতে শুধু রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিতে চিড় ধরে না তৎসঙ্গে তা এক বিশাল ফাটলে পরিণত হয়। যারা এই ফাটল ধরায় তাঁদেরকে তিনি কিভাবে চিহ্নিত করেন: "আমরা পল্টন হয়ে রাদুর জুতার দোকানের কাছ থেকে দেখছি - মিছিল আসতে লাগলো পাগলের মত - কালো - হাজার হাজার মানুষ এগিয়ে আসে শ্রোতধারার মত। সেই বিপুল স্রোতধারার মধ্যে হাজার হাজার কালো মাথা বজ্রমুষ্ঠি হাত কেবল ওঠা নামা করে আর ধ্বনি দিতে থাকে। গলি উপগলি থেকে মানুষের স্রোত এসে মিলিত হয় মূল ধারার সাথে। এত মানুষের স্রোত নবাবপুর রোড সামলাতে পারে না। মানুষের প্রবাহ গড়িয়ে পড়ে আশে পাশের ফাঁকা গলিতে।" যারা সময়ের সাক্ষী। যারা ইতিহাসের সাক্ষী, যারা এই আন্দোলন হৃদয় ও মনন দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছেন তারাই কেবল বলতে পারবেন ইলিয়াস কতখানি সততা নিয়ে আন্দোলনের এই অবিস্মরণীয় পোর্ট্রেট অংকন করেছেন। "আমাদের রক্তমাখা শার্টের লাল ঝান্ডা। বাঁশের মাথায় এই শার্ট হলো দস্তিদারের হাতের লণ্ঠন। নদীর জাহাজ নয় নদীই যেন ছুটতে শুরু করেছে দস্তিদায়ের লণ্ঠনের পিছনে। এই জনশ্রোতকে আজ সামলায় কে? জ্যাক টি এল এস আর বিবিসির লিসনার সামনে নূতন মুখ দেখতে শুরু করে। বঙ্গবাজার তাঁতী বাজারের মানুষ লুপ্ত খালের হিম হৃদপিন্ড থেকে উঠে এসেছে। ইব্রাহিম খাঁর আমলে শাহজাদা খসরুর সংগে সংঘর্ষে নিহত পাগড়ি পড়া সেপাইরা এসেছে। ইব্রাহিম খাঁর আমলে না খেতে পাওয়া মৃত মানুষেরা এসেছে। মোগলের হাতে মার খাওয়া, মগের হাতে মার খাওয়া, কোম্পানী বেনেদের হাতে মার খাওয়া মানুষ কালো চুলের তরঙ্গ উড়িয়ে চলে পায়ে পায়ে। রেসকোর্সের কালিবাড়ীর পুরোহিত নামে খাঁড়া হাতে। মজনু শাহের ফকিররা আর মসলিন তাঁতীদের আঙ্গুল কাটা মুষ্টি শ্লোগানের তালে তালে উত্তালিত হতে থাকে। তাদের ফিসফিসে খালি গা রৌদ্রে ঝলসায়। বাবু বাজার মসজিদের ইমাম মুয়াজ্জিন আর মুসল্লিরা মিছিলে যোগ দেয় আয়াত পড়ার বদলে - বৃথা যেতে দেব না হুংকার ধ্বনিতে। ক্ষত বিক্ষত লালবাগ কেল্লার সেপাইরা আসে ভিক্টোরিয়া পার্কের পাম গাছ থেকে, দড়ি ছিঁড়ে নেমে আসে মিরাটের সেপাই, বেরিলির সেপাই, সন্দ্বীপ, সিরাজগঞ্জ আর পায়রাবন্দের সেপাই। নারিন্দার পুলের তলা থেকে ধোলাইখালের রক্তাক্ত ঢেউ মাথায় নিয়ে চলে আসে সোমেন চন্দ। উত্তেজিত বরফগলা শহরের জলস্রোত মিছিলের গন্ধে যেন তাজা হয়ে ওঠে। জনগণ খোয়াব দেখেছিল পাকিস্তান হলে চাষার হক আদায় করার আইন পাশ হবে। ধনীদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরীবের মধ্যে বিলি করা হবে। সরকারী চাকরী ধরাদধর মিলে যাবে। পাকিস্তানের শাসন চলবে কোরাণ আর সুন্নাহ অনুসারে। সরকার প্রধানগণ জীবন যাপন করবে খলিফাদের মত। টুপি সেলাই করে আর কোরাণ নকল করে যা রোজগার হবে তাই দিয়ে তারা তাদের সংসার চালাবে। মুসলীম লীগের পতাকার নিচে যে বিশ্বাস আর আস্থা নিয়ে মানুষ জড়ো হয়েছিল, চাঁদ তারা মার্কা সবুজ নিশানের জন্য হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছিল সেই পাতাকার ফাঁস দিয়ে যখন বাংগালী জাতিকে নির্যাতন করে মারা শুরু হলো তখন এই জনস্রোতের উত্তাল ঢেউ আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে। জেলের তালা ভাংবো শেখ মুজিবকে আনব শ্লোগান দিতে দিতে স্বাধীকার আদায়ের প্রশ্নে যেন রুখে দাঁড়ালো। পাকিস্তান হাসিল হওয়ার ২০ বছর পর এই জনস্রোত পাকিস্তানের কাছে প্রশ্ন রাখলো - তোমরা কি চাঁদ তারা পতাকার নামে ইসলামের সোল এজেন্সি নিয়েছো? ইসলামের তোমরা বোঝোটা কি? তোমাদের জিন্নাহ কি নামাযের নিয়ত বাঁধতে জানে? জিন্নাহ কও আর লিয়াকত আলী কও এরা কি কখনও আল্লাহর ঘরের দিকে আঁছড়ে পড়েছে? জিন্নাহর মেয়ে তো বিয়ে করলো একটা খৃষ্টানকে আর জিন্নাহর ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন একজন হিন্দু নাম ভগবান ধোন্ডে।"

"চিলেকোঠার সেপাইদের পাকিস্তান মোহে যখন চিড় ধরে তখন তারা স্বাভাবিক নিয়মেই প্রতিবাদ সোচ্চার এবং আন্দোলনে ভয় পায় না। ইলিয়াসের বাবার বন্ধু ডা: ইদ্রিসকে তিনি একদিন খাবার টেবিলে খুব করে ধরেন - তর্কে পাকিস্তান এলো, দেশভাগ হলো, বঙ্গভঙ্গ এলো, তে ভাগার লড়াই এলো সোহরাওয়ার্দী, শরৎ বসু, আবুল হাশিম ইত্যাদি নাম আসতে আসতে তাঁর বাবার আমলের এক নেতাকে কুত্তার বাচ্চা বলে গালি দিলেন ইলিয়াস। তাঁর বাবা শীতল কণ্ঠে বললেন তর্ক করার সময় এই সব টার্ম ইউজ করা ঠিক নয়। তাঁর বাবা পিছন ফেরা মাত্র ঠাট্টার সুরে বললেন - আব্বার পরম সহিঞ্চুতা বুর্জোয়াসুলভ গুনটা অসাধারণ। এই সব টেবিলটক থেকেও অনুভব করা যায় শুধু যে চিলেকোঠার সেপাইয়ের দল পাকিস্তান মোহ থেকে বের আসার জন্য সোচ্চার হয়েছিলেন শুধু কিন্তু তা নয়। প্রায় সেম পার্সেন্ট মানুষই পাকিস্তানীদের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অংশ গ্রহন করে। রাজনৈতিক নেতারা

পাকিস্তান হাসিলের স্বপ্নে যখন বক্তৃতা দেয় তখন সাধারণ মানুষের মনে আর কোন সংশয় থাকে না। তেভাগা আন্দোলন স্তিমিত হতে খুব একটা বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। জমির উপর চাষীর অধিকার। জলের উপর মাঝিদের অধিকার, গরম ভাত আর মাছের খুশবুতে তাদের করোটি অনেক স্বপ্ন সুখ খেলা করে। পাকিস্তান হাসিলের মধ্য দিয়ে ক্ষুধামুক্তির স্বপ্ন দেখানো হয় মানুষকে। মানুষ এই স্বপ্নকে বিশ্বাস করতে গিয়ে দ্যাখে তেভাগার আন্দোলন প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে। গরম ভাত আর মাছের খুশবুর খোয়াব দেখতে দেখতে ইসলামের সংগে মানুষের সুখ গুলো আরও পল্লবিত হয়। ইসলাম গরীবদের হক আদায় করে। ইসলামের হক আদায়ের জন্য আমরা যাকাত ইনট্রোডিউস করবো। টু এন্ড হাফ পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউট করাবো যাকাত ফান্ডে। ইসলাম ইজ এ ফুল কোড অব লাইফ। আর কোনো রিলিজিয়নে গরীবকে এত রাইট দেয়া হয়েছে? এই ধর্মকে ব্যবহার করেই বাংগালী নামক মানুষদের ঠকানো হলো এবং তেভাগার আন্দোলনও ঠেকানো হলো। ইসলাম কি ভাই হয়ে ভাইয়ের রক্ত শোষণ অনুমোদ করে? পাকিস্তান আর ইসলামের হকের কথা মানুষকে বোঝানো হলো কিন্তু আইন করে কি ২ ১/২ % যাকাতের কোনো ব্যবস্থা হয়েছিল?”

পাকিস্তান মোহভঙ্গ আর সুখ শান্তির আকাঙ্খা যে কিভাবে ভঙ্গ হলো চিলেকোঠার সেপাই এবং খোয়াবনামায় তা-ই বিধৃত হয়েছে। মোহভঙ্গ আর সুখ-স্বপ্ন বিসর্জনের চিত্র অংকন করতে গিয়ে ইলিয়াসকে ফিরে যেতে হয়েছে ২০০ বছর আগের শোষণ ও শাসিতের বিরুদ্ধে সংঘটিত সংগ্রামের ইতিহাস উদ্ধারে।

খোয়াবনামার উপন্যাসিক শুধুই একজন নান্দিকার। সংলাপের মন্তাস নির্মাণে একের পর এক প্রতিতি চিত্র এঁকেছেন ইলিয়াস। অনুপম কৌতুক স্বপ্নভঙ্গের অন্তঃস্থ রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনাক্রম দেখেছেন তিনি নির্মোহ দৃষ্টিতে। সমাজ সচেতন বিজ্ঞানীর মত ফিরে যেতে হয়েছে অর্ধশত পূর্বের বাস্তবতার সাথে অতীত অনুসঙ্গে। লেখক জীবনের অনুসঙ্গ বাচন ভংগী —– চিলেকোঠার সেপাই থেকে খোয়াবনামায় এসে হয়ে গেছে লোকজ গোলাপী আভায় অনপ্রখর। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে ইলিয়াসের গদ্য ভাষা স্বচেষ্ট শিল্পকৃতি নাকি উপন্যাস জগতে লেখকের স্বতোৎসারণ। চার দশকের রাজনৈতিক বিষয় ঘটনাক্রমের তরঙ্গাঘাতের গ্রাম জীবনের আবর্তন খোয়াবনামা উপন্যাসের প্রধান বিষয়। শ্রেণী সম্পর্কের পূণর্বিন্যাস সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন পার্টির অনুপ্রবেশ, ইসলামীয় আবেগ, অভাব অনটন, শোষণ, বঞ্চনা, লোক বিশ্বাস, স্বপ্নের পাঁকে ডুবে থাকা মানুষের ঘোরগ্রস্ত জীবন, ঐন্দ্রজালিক এক নকসী আবরণ সুষুপ্ত মানসের প্রতিভাসে দীপ্যমান। খোয়াবনামা একক কোনো ব্যক্তি বা সমাজ নিয়ে নয়। গ্রাম বাংলার অসংখ্য মানুষের জীবন ও স্বপ্ন নিয়ে মনন সৃজনের ধ্রুপদী নান্দনিক আয়োজন। মুসলমান আর পাকিস্তান ঘিরে স্ফীতকায় এক খোয়াব কালাতহার বিল বাসিন্দাদের মনের পরতে পরতে জমে ওঠে। তমিজের ধান-জমির স্বপ্ন, শরাফত মন্ডল ও কালাম মাঝির সম্পদ বৃদ্ধির স্বপ্ন, আজিজের ইট ভাটির স্বপ্ন, কাদেরের জেলা নেতা হওয়ার স্বপ্ন, তহসেন উদ্দিনের বড় দারোগা হওয়ার স্বপ্ন, ইসমাইল হোসেনের মন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন, এদের স্বপ্নগুলো বাড়ে, আকার নেয়। একের স্বপ্নের সঙ্গে অপরের স্বপ্নের সংঘাত হয়। আবার কেউ কেউ এক অন্যের স্বপ্ন হাতড়েও নেয়। পাকিস্তান হাসিলের পূর্বে বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর প্রান্তিক অংশের স্বপ্ন দেখা আর সেই স্বপ্ন ভঙ্গেরই মহাকাব্যিক উপন্যাস আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের খোয়াবনামা। তাঁর নিজের লেখা সম্পর্কে তিনি বলেন - বিষয় বস্তু যদি লেখকের গভীর ভেতর সাড়া তুলতে না পারে বা বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে লেখক যদি জিনিসটাকে নিজের করে তুলতে না পারেন তো কোনো লিপিকৌশলের সাধ্য নাই যে তাকে ঠিকমত প্রকাশ করে। উপযুক্ত লিপিকৌশলের অভাবে কতো সিরিয়াস বিষয়বস্তু মুখ থুবড়ে নিচেই পড়ে থাকে এবং তা কাউকে আকর্ষণ করতে পারে না। পুতুল নাচের ইতিকথা কি পদ্মা নদীর মাঝির কথাই ধরা যাক একটি শশী কি একটি কুবের নির্মাণ করার মত মানুষ তো গন্ডায় গন্ডায় জন্ম হয় না। দেশের শোষিত মানুষের বৃহত্তর ভাগ কৃষক ও দিনমজুর। এই কৃষকের পরিচয় জানার জন্য যেতে হয় তারা শংকরের কাছে। গ্রামের মধ্যবিত্তের দারিদ্র ও গ্লানির রূপদান করেন বিভূতি ভূষণ বন্দোপাধ্যায়, চল্লিশ দশকের যুদ্ধ, দূর্ভিক্ষ, দাঙ্গা ও দেশ ভাগের যন্ত্রণা আমূল বিঁধে নিতে হয়। একজন তথাকথিত নির্জনতার কবিকে। যে সব বই মিহি চটকানো রূপ দিয়ে পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে তারা যত বড় ঝানু জাদুকর ততবড় শিল্পী তারা নন। বেশীর ভাগ গল্প উপন্যাস সেকেন্ড হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে বানানো। পাঠকের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে পারে এ রকম রচনার সংখ্যা খুবই কম। যেমন ল্যাটিন আমেরিকার গল্প অনেক বেশী সৎ ও গভীর। তাদের গল্পে ব্যক্তিকে দেখা যায় সমাজের ও সময়ের শোষণ ও নিপিড়নের প্রেক্ষিতে। সমাজ কি বসে থাকে! বাংলাদেশের লেখকেরা একই

গল্প আর ফর্ম নিয়ে কতোদিন এভাবে বসে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই ব্যক্তির ক্ষয় প্রকাশিত হতে শুরু করে। ব্যক্তির গভীর ভেতরে অনুসন্ধান করার অপ্রীতিকর ও পরিশ্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেন মানিক বন্দোপাধ্যায়। ইলিয়াসের খোয়াবনামা উপন্যাসে ভূমিহীন চাষী বর্গাদার আধিয়ার চাষীদের জীবন কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই শাসন ও শোষণের বর্ণনা পাওয়া যায় সত্যেন সেনের লেখা থেকেও। ইলিয়াস তার বর্ণনায়— সারাজীবন ক্ষুধার্ত মানুষের কথা বলতে গিয়ে বর্ণনা করেন "ওই গাঁয়ে কারো অবস্থাই ভালো লয় গো। বারো মাসই আকাল বারো মাসই টানাটানি। বঙ্কিম চন্দ্র তাঁর আনন্দ মঠে, সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে যে এক পেশে সাম্প্রদায়িক একটি চিত্র তুলে ধরেছেন যে সম্পর্কে সরাসরি কোনো প্রতিবাদ না করে তার অসাড়তা অসত্যতা ইলিয়াস তুলে ধরেছেন তাঁর খোয়াবনামায়। যদিও এর পটভূমি গুটি কয় গ্রাম, লোকালয় ও একটি বিল হলেও এর ঐতিহাসিক স্মৃতি বহু পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত।

সাম্প্রতিক কালের আফ্রিকান উপন্যাসে অন্য রকম দৃষ্টান্তের উদাহরণ পাওয়া যায়। নাইজেরিয়ান লেখক চিনুয়া এ্যাকিবির উপন্যাসে নাইজেরিয়ার গ্রামীন জীবনের গভীর ভেতরে ঢোকার সফল প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আফ্রিকান মানুষদের জীবন-যাপন, আঞ্চলিক ভাষা-উপভাষার প্রবাদ, প্রবচন, শ্লোক উপমা প্রভৃতির অপূর্ব ব্যবহারের ফলে সেই জীবন-যাপন একেবারে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। ভিন্ন সভ্যতার ভিন্ন রুচির ইংরেজীতে লেখা উপন্যাসগুলিতে নাইজেরীয় সংস্কৃতি উঠে এসেছে তার অস্থিমজ্জা নিয়ে। উল্লেখ করতে আপত্তি নেই যে এর বেশীর ভাগ প্রবাদ ও শ্লোক ইংরেজী বা পাশ্চাত্য এমনকি আধুনিক রুচি অনুসারে স্থূল ও অশ্লীল। চিনুয়া একিবির মত লেখক ও বাংলাদেশে আছেন। তাদের দক্ষতা ও নৈপুন্য চিনুয়া একিবির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আমাদের লেখকদের লেখায় আমাদের গ্রামের নিম্নবিত্তের সংস্কৃতি আমাদের শিল্প সাহিত্যের বাইরে রয়ে যায়। এর বিকাশ ও ঘটে না। বিবর্তনও হয় না বরং আমাদের শিল্প সাহিত্যের সৃজনশীলতা হারিয়ে পরিণত হতে থাকে মধ্যবিত্তের সৌখিন ও মনোরঞ্জনকারী হালকা বিষয়ে।

১৮১২ সালের নেপোলিয়নের মস্কো আক্রমন ও বিজয় এবং সেই নগরীর প্রভূত ধ্বংস সাধনের পর ফিরতি পথে প্রচন্ড তুষারপাত, তাঁর পিছু হটা সৈন্য বাহিনীর উপর রুশদের গেরিলা আক্রমনের মুখে বিপর্যস্ত ও প্রায় নিশ্চিহ্ন নেপোলিয়ান বাহিনীর বিশ্ব বিখ্যাত কাহিনী রুশ ইতিহাসের এই হর্ষ বিষাদময় অধ্যায় নিয়ে লেভ তলস্তয়ের অমর উপন্যাস যুদ্ধ ও শান্তি বিশ্ব সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। স্পেনের ছোট্ট শহর গের্ণিকায় নাৎসী বাহিনীর অমানবিক ধ্বংসযজ্ঞের চিত্র আঁকেন পাবলো পিকাসো। গের্নিকা নামক এই চিত্রটি পিকাসের কালোত্তীর্ণ এক শিল্পকর্মের মর্যাদা লাভ করে। তুর্কীদের বঙ্গ বিজয়ের মধ্য দিয়ে এ দেশের মানুষ নতুন ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। একই সময়ে নদীয়ার শ্রী চৈতন্য দেব নতুন ধর্ম আন্দোলনে জাতীয় সংকটের সৃষ্টি করে। এরপর শুরু হয় বর্গীদের উৎপাত (মারাঠা আক্রমন) পশ্চিম বাংলায়। এরপর মধ্যযুগীয় নবাবী শাসনের পতন ঘটিয়ে নতুন বাণিজ্যিক শক্তি বাংলা দখল করে। পতন বা দখল ঘটনায় মুসলমান বাঙালি জাতি রিক্ততা বোধ করলেও হিন্দু সম্প্রদায় তখন ইংরেজ রাজত্ব স্থায়িত্ব হওয়ার চিন্তা ও চেষ্টা করেছে। ইংরেজদের ভারত দখল, সিপাহী বিদ্রোহ পদানত বাংগালী জাতি মূলতঃ এই সব ঘটনা পরম্পরার কোনো খোঁজই মধ্যবিত্ত রাখেনি।

বাংগালীর নিস্তরঙ্গ জাতীয় ইতিহাসে, দুনিয়া কাঁপানো এক ভাষা ভিত্তিক মুক্তিযুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাঙ্গালী জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ, স্বাধীনতা অর্জিত হলেও বছর তিনেকের মধ্যে সামারিকতন্ত্রের হাতে ক্ষমতায়ন হয়ে যায়। স্বাধীনতা বিরোধীদের খুব দ্রুতগতিতে পূনর্বাসনের মধ্য দিয়ে সামরিকতন্ত্র তাঁদের আসনও পাকাপোক্ত করে। স্বাধীনতার স্বপক্ষ শক্তি ইতিহাস নির্মাতার দায়িত্ব বহনকারী হলেও কেবল মাত্র সামরিকতন্ত্র টেকানোর তাগিদে নতুন আলখেল্লা পড়ে নামমাত্র কয়েকজন ব্যক্তিকে নিয়ে গনতান্ত্রিক(?) সরকার গঠন হলেও এর পিছনে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সামরিক ব্যক্তিবর্গ ও স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিবর্গ। নিশ্চিদ্র নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা, এবং দাঁড়ানোর মত মজবুত একটি প্লাটফর্মও পেয়ে যায় তারা। ইতিহাস বিকৃতির বিষয়টি এদের হাতে এত বেশী প্রাধান্য পায় যে বাঙালি জাতির জাতীয় আবেগ অনুভূতি সম্পূর্ণ নির্বাসিত হয়। ফলাফল স্বরূপ এখন পর্যন্ত মহৎ কোনো সাহিত্য সৃষ্টির মত জাতীয় মানসিকতা তৈরী হয়নি। যেমনটি হয়েছে লেভ তলস্তয়ের যুদ্ধ ও শান্তি; এরিখ মারিয়া রেমার্কের অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট। চার্লস ডিকেন্সের এ টেল অব টু সিটিজ, আমেরিকার গৃহযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ঘটনাকে নিয়ে মিচেল লিখেছেন গোন উইথ দ্য উইন্ড। পাঞ্জাবী সাহিত্যিক-সাংবাদিক খুশ বন্তশিং এবং ইংরেজী উপন্যাস ট্রেণ

টু পাকিস্তান। এই উপন্যাসটিতে সীমান্তের উভয় পার্শ্বে সংঘটিত হত্যাকান্ডের যে নিরপেক্ষ চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাতে শুধু এক পেশে হত্যাকান্ডেরই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থান তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়নি। এক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব ছাড়াই ইলিয়াস অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়গুলির তোয়াক্কা না করেই রাজনৈতিক ও সামাজিক চিত্রের এক অসাধারণ দলিল তৈরী করেছেন এবং এখন পর্যন্ত এ অবস্থানে তিনি অদ্বিতীয়।

আমরা জেমস জয়েস এর দূর্বোধ্যতার কথা বলছিনা। অথবা মার্সেল প্রুস্ত এর রিমেমব্রেন্স অব থিংস পাষ্ট এর বিশালতার সংগেও তুলনা করছিনা। একজন লেখক হিসেবে ইলিয়াস শ্রেণীবোধ জাতিবোধ ও প্রগতিশীলতার দাবীকে নিজের ভেতরে ক্রমাগত সমালোচনা ও পর্যালোচনার ধারা অব্যাহত রেখেছেন। নির্বাচনের জন্য পোষ্টারই যথেষ্ট, কিন্তু পোষ্টার দিয়ে বিপ্লব হয় না এর জন্য চাই সাহিত্য। মননের নিরপেক্ষতা অর্জনকারী দূরত্বে না পৌঁছালে জাতীয়ভাবে বিভাজক ঘটনা কেন্দ্রীক কোনো মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

জাপানের ওয়ে কেনযাবুরোর সাইলেন্ট ক্রাই বা নিরব আর্তনাদ উপন্যাসের সংগে খোয়াবনামার কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মীর মোশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুর মত উপন্যাসের মধ্যখানে পাঠককে সরাসরি উদ্দেশ্য করে বক্তব্য প্রদান করেননি তিনি। তবে অদৃশ্য বর্ণনাকারী কোনো চরিত্রের কথায় কিছু বৈশিষ্ট লক্ষ্য করা যায়। স্পেনের কামিলা হোসেসেলা কিংবা জাপানের ওয়ে কেনযাবুরের গদ্য ভংগির সংগে ইলিয়াসের গদ্য ভঙ্গির তুলনা করলে ইলিয়াসের গদ্যভঙ্গির আলাদা মর্যাদা নির্ধারণ করা যায়। বাংলা সাহিত্যে খেউর খিস্তি কিংবা অশ্লীল শব্দের ব্যবহার, সংলাপ হিসেবে বহুকাল ধরেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ইলিয়াসের বর্ণনায় এই অশ্লীল শব্দগুচ্ছের প্রকাশ ভংগি মনোত্তীর্ণ বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম ব্যবহার।

হেনরী মিলারের ট্রপিক অব ক্যান্সার, ট্রপিক অব ক্যাপ্রিকর্ণ এ এরকম ব্যবহার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। শিল্পরূপ ব্যহত হওয়ার ভয়ে তিনিও বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার পরও কোনো আপোষরফা করেননি। কারণ মানসিক ট্রাজেডির নায়কহীন খোয়াবনামা গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের শতবর্ষের নির্জনতার মত ততখানি ব্যপকতা পায়নি। যদি তা পেতো তা হলে হয়তো এই বইখানি বিশ্বসাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদে পরিণত হতো। তবে বিশ্বখ্যাত লাতিন আমেরিকার উপন্যাসিক ইসাবেল আইয়েন্দের উপন্যাস দি হাউস অব স্পিরিটস এর তুলনা করা চলে কিংবা তুলনা করা চলে আফ্রিকান ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচিবির থিংস ফল এপার্ট এর সংগে। এক্ষেত্রে আচিবির উপন্যাসে আছে সভ্যতার সংঘাত এবং তার ফলে সৃষ্ট করুণ মানবিক ট্রাজেডির বিশ্বজনীনতা আর ইলিয়াসের লেখার মধ্যে এই জিনিসটিই অনুপস্থিত। এই উপন্যাসের মধ্যে রাজনীতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই উপন্যাসটির মধ্যে মানুষ তথা সমাজের এতো ব্যাপক বিষয় ফুটে উঠেছে যে অনেক ক্ষেত্রে তা পাঠকের পক্ষে বুঝে ওঠা কঠিন হতে পারে।

উপমহাদেশীয় লেখকদের মধ্যে তারাশংকর অতীতে যতখানি যান ততখানি ইলিয়াসও যান তবে ইলিয়াসের অতীত চিত্রিত হয় এক ভিন্ন ডাইমেনসনে। অন্য দিকে সৈয়দ ওয়ালি উল্লাহ অতীত, দূর অতীতে প্রবেশ করেন না কিন্তু তিনি প্রবেশ করেন কুসংস্কার আর লোক বিশ্বাসের ভেতর দিয়ে এক কল্পবাস্তবতায়। সতীনাথ ভাদুরী আর তারাশংকর একদিকে তো সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ অন্য দিকে। মানিক বন্দোপাধ্যায় আর অমিয় ভূষণ মজুমদারকে দুদিক থেকেই ছোঁয়া যায়। বিষ্ফোরিত কমল কুমার মজুমদার আর মহাশ্বেতা দেবীর নির্মানের পৃথিবীই আলাদা রকমের। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বাদ বিচারে ইলিয়াস তার উপন্যাসে মিথ অবলম্বন করেছেন, ভেংগেছেন এবং নির্মান করেছেন। হিস্পানী সাহিত্যে গত কয়ে দশক ধরে মীথ সৃজনশীলতার কৌশল ও উপাদান হয়ে উঠেছে। ইলিয়াস মীথ এভাবেই নির্মান করে দেখান যে মানুষের বিদ্রোহের আর লড়াইয়ের স্মৃতি থেকে যায় তার অবচেতনার পরতে পরতে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে এবং তা বেরিয়ে আসে কখনো মন্ত্র বা গানের শোলক হয়ে কখনো বা আঁকিবুকি টানা নক্সার ভেতর দিয়ে আবার কখনো বা স্বপ্ন ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে।

ইলিয়াস তার ছোট গল্পেও একই ধারা অবলম্বন করেছেন, পূর্বসূরীদের পথ ধরে তিনি এগুতে চাননি বলে হাসান আযিযুল হক বলেন - ইলিয়াসের লেখা পড়তে কোনো বিনোদন হয় না। কোনো রস সঞ্চার হয় না। সংস্কৃতির দুধ আর মিষ্টান্ন মেলে না। উদার মানবতায় সহানুভুতি মমতা করুণা অনুভব করা যায় না। চোখ বাষ্পাকুল হয় না, উল্টো স্বাদ মেলে কষা, মনে হয় কঠিন চাবুক দিয়ে কেউ বুঝি শারিরীক ভাবে ক্ষত বিক্ষত করছে। শরীরের এক ইঞ্চি

জায়গাও বাদ পড়ে না। মানিক বন্দোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বা জগদীশ গুপ্তের সংগে ইলিয়াসের তুলনা চলে না। তাঁদের কলম থেকে বিষ চুইয়ে পড়লেও অমৃত ক্ষরণ হয়েছে বেশী - কর্কশ সত্য হচ্ছে অমৃত ভাষণের সঙ্গে অমৃত ভাষণের সঙ্গে অনত ভাষণের তেমন কোনো তফাৎ নেই। সত্যকে লুকাতে চায় যে সাহিত্য সে সাহিত্য আবর্জনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইলিয়াস বাম আন্দোলনের সমর্থক সত্ত্বেও তিনি তাঁদের একজন কড়া সমালোচক ছিলেন বলেই তাঁদের অগভীর দূর্বলতা ও যান্ত্রিকতা সম্পর্কে তাঁর পর্যালোচনা ও সমালোচনা ছিল অসাধারণ শক্তিশালী। বাংলাদেশের সরকারী প্রচার মাধ্যমগুলোকে তিনি কপটদের আশ্রয় কেন্দ্র বলে চিহ্নিত করতেন। ওই সব কপটদের আশ্রয়কেন্দ্রে তাঁর মত মুসাফিরের জায়গা না পাবারই কথা। তিনি তাদের আচরণে ক্রুদ্ধ হতেন কিন্তু অবাক হতেন না।

ডান পা শূণ্য ইলিয়াসের মুক্তিযুদ্ধের কথা আর লিখে যেতে পারলেন না। এই কাজটির জন্য তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে মাত্র দু'বছর সময় ভিক্ষে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে আকাঙ্খা পূর্ণ হওয়ার আগেই মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তিনি মৃতুতে আশ্রয় নিলেন।